

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

— ০ —

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

সূচী

(এইসকল মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

প্রবন্ধ	লেখক	পৃষ্ঠা
বগুড়ার নবাবিষ্কৃত ভগ্ন শিলালিপি	... শ্রীহরিদাস মিত্র এম্ এ ...	১৯
তরুণীসম্প্রদেয় পদাবলী	... শ্রীভাবকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ ...	২০৯
শ্রীমদাশ্বকোষের উত্তর	... শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, রায় বাহাদুর, বিজ্ঞানিধি, এম্ এ ...	২২
যোগেশবাবুর কৃষ্ণকীর্তনে সংশয়	... শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ ...	২৩১

— ০০ —

১৩১৫ সালের বার্ষিক কার্য-বিবরণের পরিশিষ্ট	৫১-৭৭
১৩২৬ সালের মাসিক ৭ বিশেষ অধিবেশনেব কার্যবিবরণী	৬৩-৮৬

Printed by—R. C. Mittra at the 'Vishvakosha Press',
9, Vishvakosha Lane, Bagbazar, Calcutta

বিশেষ জ্ঞেয়—সদস্যপণের ঠিকানা পরিবর্তন ঘটিলে তাঁহারা
অনুগ্রহপূর্বক যথাসময়ে কার্যালয়ে সংবাদ দিবেন ।

বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন

‘বঙ্গদর্শন’ আবার বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে বিরাজ করুক! যে ‘বঙ্গদর্শন’ নব যুগের নূর-সান্নিধ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, যে ‘বঙ্গদর্শন’ নূতন ভাবে, নূতন চিন্তায়, নূতন শক্তিতে বাঙ্গালী মাহিত্যকে অনুপ্রাণিত ও সমৃদ্ধ করিয়াছিল, আমরা সেই

চারি বৎসরের চারি খণ্ড ‘বঙ্গদর্শন’

প্রকাশিত করিব। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বঙ্গদর্শন’ নিহন্ত ছন্দ। এত শেট ‘বঙ্গদর্শন’ যদি বা এখনও দৈবাৎ পাওয়া যায়, তাহাও

১৫০ দেড় শত, ২০০ দুই শত টাকা মূল্যে

কিনািত হয়।—এমন বাঙ্গালী পাঠক নাহি, যিনি বঙ্কিমের ‘বঙ্গদর্শন’র নাম শুনিয়া নাহি। কিন্তু ‘বঙ্গদর্শন’ পড়িয়াছেন? কয় শেট চোখে দেখিয়াছেন? সেট মুছিয়া ‘বঙ্গদর্শন’ আমরা অত্যন্ত সুগভ মূল্যে আপাতক: কেবল

‘সাহিত্য’র গ্রাহকগণকে

দেবার ব্যবস্থা করিলাম। প্রথম সংস্করণ তাঁহাদের জন্য। এক অল্প—নাঈদমাত্র মূল্যও কেবল তাঁহাদেরই স্ববিধায় জন্ম। এই তুমুলোর দিন, কাগজ, ছাপাই বাধাই পড়তির অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধি কালে, ‘সাহিত্য’র গ্রাহকগণের জন্য, ‘বঙ্গদর্শন’র

প্রথম বৎসরের মূল্য—২ দুই টাকা মাত্র

দৃষ্ট হইল। ‘বঙ্গদর্শন’র বার্ষিক মূল্য ছিল,—তিন টাকা ছয় আনা। এখন তাহা অমূল্য—এসম্ভব মূল্য দিয়াও পাওয়া যায় না। সেই ‘বঙ্গদর্শন’ সাহিত্যের গ্রাহকগণ দুই টাকায় পাইবেন।

‘বঙ্গদর্শন’র পুস্তকদ্বী এবং তাহার পরবর্তী বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যে উচ্চ নীচতা, তাহা অপরিমিত। দার্জিলিং হইতে বাঁহারা কাকনগড়া শিখরমালা দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, সেই শ্রদ্ধভেদী শৈলসম্রাটের উদয়রবিংশ্মসমুজ্জল তুষারকিরীট চতুর্দিকের নিম্নক গিবি বিবিধ-বর্ণের কত উর্ধ্বে সমুথিত হইয়াছে! বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী বঙ্গসাহিত্য সেইরূপ আকাশক অত্যন্ত লাভ করিয়াছে, একবার সেইনী নিরীক্ষণ এবং পরিমাপ করিয়া দেখিলেই বঙ্কিমের প্রতিভার প্রভু বল সহজে অনুমান করা যাইবে।—রবীন্দ্রনাথ।

‘বঙ্গদর্শন’ই বঙ্গসাহিত্যের সেই তুমারকিরীট!

বঙ্কিমের ‘বঙ্গদর্শন’ যে আকাষে, যে অক্ষরে, যে ভাবে ছাপা হইয়াছিল, আমাদের সংস্করণও ঠিক সেই ভাবে ছাপা হইবে। অর্থাৎ, ইহা—FAC-SIMILIE সংস্করণ।

এ বৎসর ‘সাহিত্য’র উৎকর্ষ বিধানের জন্য যথেষ্ট ব্যয়োজন হইয়াছে।—প্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাসাগর, শ্রীমতী সলিমা দেবী, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ উপহাস, শ্রীযুক্ত শ্রীকান্তনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত স্বধীকান্তনাথ চাকুর, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতির ছোট গল্প প্রভৃতি এ বৎসর ‘সাহিত্য’কে আশ্রয়িত করিবে।

যাহারা তিন টাকা দিয়া ‘সাহিত্য’র গ্রাহক হইবেন, অর্থাৎ ‘সাহিত্য’র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা ও ‘বঙ্গদর্শন’র প্রথম বর্ষের মূল্য দুই টাকা, মোট পাঁচ টাকা পাঠাইবেন, তাঁহারা ‘বঙ্গদর্শন’ পাইবেন। নিম্নলিখিত ঠিকানায় টাকা পাঠাইবেন।

সম্পাদক, সাহিত্য—২১ রামধন মিত্রের লেন, গুমপুকুর,

ষড়্বিংশ ভাগের সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। আলোচনা—	শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৭
২। এ দেশে ভূত্মবাদ—	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, রায় বাহাদুর, বিজ্ঞানিষি, এম্ এ	৪৭
৩। চণ্ডীদাস—	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্ এ, সি আই ই	৭৫
৪। চট্টগ্রামে প্রচলিত বঙ্গভাষা—	শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ	১৬৬
৫। তরুণীবরণের পদাবলী—	শ্রীযুক্ত তারাকেশব ভট্টাচার্য্য এম্ এ	২০২
৬। দ্বাদশ শতকের বাংলা শব্দ—	শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ	২৩
৭। পাহাড়ী জাতির মধ্যে অধ্যাপনার উপায়—	ডাঃ শ্রীযুক্ত সবসীলাল সবকার এম্ এ, এম্ এম্ এস	১২৬
৮। পোনঃপুনিক দশমিক রাশি ও ভাগ	শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ কোন্ডার	৫৩
৯। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে চণ্ডীমণ্ডল—	শ্রীযুক্ত তারাশ্রম ভট্টাচার্য্য	১৪৭
১০। বগুড়ার নবাবিকৃত ভগ্ন শিলালিপি	শ্রীযুক্ত হরিন্দাস মিত্র এম্ এ	১২৭
১১। বাংলা শব্দকোষের উত্তর	শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, রায় বাহাদুর, বিজ্ঞানিষি	২০১
১২। ভারতে মানবের প্রাচীনত্ব ও নানাবিধ চারি লক্ষ বৎসর পূর্বের কয়েকটি ঐতিহাসিক নিদর্শন—	শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ	১৮৭
১৩। যোগেশ বাবুর “শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সংশয়” প্রবন্ধের আলোচনা	শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ	২৩১
১৪। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সংশয়	শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, রায় বাহাদুর, বিজ্ঞানিষি, এম্ এ	১২
১৫। সমস্তটের পূর্বে	শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, বিজ্ঞাবিনোদ, এম্ এ	১
১৬। সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম	শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল	১৪১
১৭। সাড়ে সাত শত বৎসর পূর্বের বাংলা শব্দ	শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, রায় বাহাদুর, বিজ্ঞানিষি, এম্ এ	৮৫

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

সমতটের পূর্বে*

(শ্রীহট্ট-কাছাড় অনুসন্ধান-সমিতির পক্ষে লিখিত)

চীনদেশীয় পরিব্রাজক য়ুনচুয়াং ভাবত-ভ্রমণে আসিয়া নানা দেশ পর্য্যটনপূর্বক সমতট পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। সমতটের পূর্ব দিকে তিনি যান নাই। না গেলেও সমতটে অবস্থান-সময়ে তৎপূর্বদিকে ছয়টি প্রদেশের নাম তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল, তিনি যথাক্রমে সেইগুলির নাম ও দিক্ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ; -

- ১। শিহ্-লি-চ-ট-লো—সমতটের উত্তর-পূর্বে পর্বত-মধ্যে, সমুদ্র-পার্শ্বে।
- ২। ক-মো-সং-ক—শিহ্-লি-চ-ট-লোব দক্ষিণ-পূর্বে সমুদ্রের সাধার উপরে।
- ৩। তো-লো পো তি—কমোলঙ্কের পূর্বে।
- ৪। ই-শং-ন পু-লো—তো-লো-পোতির পূর্বে।
- ৫। মো-হ-চন-পো—ই-শং-ন-পুলোর পূর্বে।
- ৬। ইয়েন্-মো-ন-চো—মো হ চন-পোব দক্ষিণ-পশ্চিমে।

এই সকল দেশ কোথায়, ইহা লইয়া প্রত্নতাত্ত্বিক মহোদয়গণ বহু পবেষণা করিয়াছেন এবং নানা মত প্রচাৰ করিয়াছেন। এই বিষয়ের আলোচনা করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

য়ুনচুয়াংএর ভ্রমত-ভ্রমণ বিবরণের বহু সটিক অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 'হার্গিস টমাস ওয়াটস'কৃত অনুবাদই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পবিগৃহীত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ-ভাষাবিজ্ঞানী ডাঃ রীস্ ডেভিড্‌স্‌ রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ হইতে ওয়াটাস্ সাহেবের উক্ত অনুবাদ প্রকাশ উপলক্ষে লিখিয়াছেন ;—

“As Mr. Watters probably knew more about Chinese Buddhist Literature than any other European scholar and had at the same time a very

* য়ুনচুয়াং-সাহিত্য-পরিষদের ২৫শ বর্ষের দশম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† গ্রন্থকাহ্নের (শ্রীমুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস সমালোচনা, ভারতী, অগ্রহায়ণ, ১৩২২) অন্তর্ভুক্ত ভাবে এতদ্বিষয়ে সম্যক আলোচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই ক্ষেত্রের ব্যাপারের বিস্তারিত আলোচনা ইতরা একান্ত আবশ্যক, তাই বর্তমান গ্রন্থের অবতারণা।

his knowledge both of Pali and Sanskrit, he was the very person most qualified to correct those mistakes (made by Mr. Beal) and to write an authentic work on the interpretation of Yuan Chwang's most interesting and valuable records."*

বিশেষতঃ ওয়াটাস সাহেবেব ঐ গ্রন্থের পৰিশিষ্ট-ভাগে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্বলন-কারিগণের অগ্রণী, 'সুপ্রসিদ্ধ ভিন্সেন্ট এ. স্মিথ সাহেব কতিপয় মূল্যবান টীকা সংযোজিত করিয়া ইহার সারবত্তা আবণ্ড পৰিবৰ্দ্ধিত করিয়াছেন। অতএব বৰ্তমান গ্রন্থে ওয়াটাস সাহেবের গ্রন্থখানি অবলম্বন করিয়াই মনীয় বক্তব্য লিপিত হইয়াছে।

প্রথমতঃ সমতটের অবস্থান নির্ণয় করিতে হইবে। চীন পর্যটক পৌগু বৰ্দ্ধন হইতে ৯০০ লি (১ লি = ১ মাইল) পূর্বদিকে গিয়া, করতোয়া পার হইয়া, কামরূপ রাজ্যে উপস্থিত হন এবং কামরূপ হইতে দক্ষিণে ১২০০ কি ১৩০০ লি চলিয়া সমতটে পৌছেন। মনে রাখিতে হইবে যে, তখন করতোয়ার পূর্ববর্তী ভূভাগ কামরূপের অন্তর্গত ছিল। অতএব ঢাকা, করিমপুর প্রভৃতি লইয়া বর্তমান ঢাকা-বিভাগের দক্ষিণ-পূর্বাংশ ও মুন্সরবন লইয়া 'সমতট' রাজ্য অবস্থিত ছিল। ঐতিহাসিক ভিন্সেন্ট এ. স্মিথ সাহেব তদীয় টীকার সঙ্গে ওয়াটাস সাহেবের গ্রন্থের পৰিশিষ্ট-ভাগে যে একটি মানচিত্রে চীন পর্যটকের ভারত-ভ্রমণের প্রদেশ-গুলি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে সমতট বোধ হয়, বিস্তৃত ভাবেই দেখান হইয়াছে। এই সমতট হইতে ব্রহ্ম-চূয়াং ফিবরা পশ্চিম অভিমুখে ৯০০ লি গিয়া, তান্-মো-লিহ্-তি বা তান্নলিপি (বর্তমান ভমলুক) প্রাপ্ত হন, তাহাতেও সমতটের অবস্থান প্রাপ্তকালরূপ বলিয়াই প্রমাণিত হয়।

এখন সমতটের উত্তর-পূর্ব দিকে "শিহ্-লি-চ-ট-লো" রাজ্যটি কি, তাহা সর্বদোষ বিবেচ্য। বিস্তৃত সংস্কৃতে ইহা পরিবর্তিত কবিলে "শ্রীকট" দাঁড়ায়। এতৎসবকে আমরা অঙ্কুর বলিয়াছি ;—

In fact what the people whom Yuan Chwang consulted said was "Srihabta" which the pilgrim heard as 'Srikehatra' and reproduced in his defective Chinese tongue as 'Shihli Chatalo'†

অর্থাৎ জিজ্ঞাসিত দেশটির নাম লোকে বলিয়াছিল "শ্রীহট্ট", — পর্যটকের কাণে তাহা "শ্রীকট"রূপে প্রতিভাত হইয়াছিল; তাহাই বিকৃত চীন-ভাষার শিহ্-লি-চ-ট-লো হইয়া পড়িয়াছে। এই বিষয়ে একটি কথা প্রাধান্যযোগ্য। পূর্বাঞ্চলে—সমতট ইত্যাদিতে উচ্চারণের যে একটা বিশেষত্ব ছিল, তাহার চিহ্ন আজিও বর্তমান। অধুনা অসমীয়া ভাষার পূর্ববঙ্গের প্রাচীন উচ্চারণের ধারার কিছু কিছু মিশ্রণ পাওয়া যায়। "স"-ভারের "হ"

* Preface to Watter's Yuan Chwang Vol i,

† Epigraphia Indica; Vol XII, (P. 67).

উচ্চারণ তত্ত্বও একটি; এবং “হ”-কারের উচ্চারণ অনেকটা “থ”এর মতই শুনায। প্রাচীন শতাব্দী পূর্বে চৈনিক পরিব্রাজকেরও সেই ভ্রান্তি ঘটিয়াছিল। এই শ্রীক্ষত্র বা শ্রীক্ষেত্রকে কেহ কেহ ব্রহ্মদেশের “থারেখেন্ডর” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং “বালিলার ইতিহাস”-লেখক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই মত অবলম্বন করিয়া ইহা “বর্তমান প্রোম” বলিয়াছেন।* কিন্তু তাহা বা “থাবেখেন্ডর”কে (শ্রীক্ষত্র) য়ুন-চুয়াংএর “শিহ্-লি-চ-ট-লো” মনে করেন, তাহা একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা ভাবিয়া দেখেন নাই। জেনারেল কেমার-প্রণীত “হিস্টরি অব বর্মা” (ব্রহ্মদেশের ইতিহাস) গ্রন্থে লিখিত আছে যে, “থারেখেন্ডর” রাজ্য ২৫ খৃষ্টাব্দে অভ্যর্থিত হইয়া যায়।† তাহা হইলে ইহার প্রায় পাঁচ শতাব্দী পরে য়ুন-চুয়াং আসিয়া ঐ রাজ্যের সংবাদ কিরূপে পাইলেন, অথবা কি জ্ঞাত ইহা উল্লেখ-যোগ্য মনে করিলেন, বুঝা গেল না। তাহারা আরও একটি কথা ভুলিয়া যান যে, শিহ্-লি-চ-ট-লো রাজ্যটি (near the sea) সমুদ্রের নিকটে অবস্থিত বলিয়া য়ুনচুয়াং বলিয়াছেন। “থারেখেন্ডর” (বা প্রোম) এবং সমুদ্রের মধ্যে অনেক ব্যবধান এবং সমুদ্র হইতে প্রোম বাইতে হইলে হ্রস্বপ্য পর্কত অতিক্রম কবিত্তে হয়। ফলতঃ শিহ্-লি-চ-ট-লো বা “শ্রীক্ষত্র” শ্রীহট্টই বটে—“থারেখেন্ডর” নহে।‡

এই শিহ্-লি-চ-ট-লোর অপর এক দাবিদার সম্প্রতি হাজির হইয়াছেন। চট্টগ্রামের কোনও কোনও দেশবাসী ব্যক্তি জেলাটির প্রাচীনত্ব সূচনার্থ ইহাকেই চীন পৰ্ব্বতকের কবিত্ত দেশ বলিয়া নির্দেশ করেন এবং বলেন যে, “শিহ্-লি-চ-ট-লো” “শ্রীচট্টল” নামের চীন সংস্করণ। আপাততঃ ইহা বেশ সমীচীন দেখায় বটে; বোধ হয় যেন, ইহাই সন্দেহ সিদ্ধান্ত। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাতে কয়েকটি গুরুতর আপত্তির কারণ পাওয়া যাইবে। প্রথমতঃ “চট্টল” শব্দটি আধুনিক কোনও কোনও ভাষায় দেখা যায় বটে, কিন্তু ইহা চাট্টগ্রাম শব্দের সংস্কৃতীকরণ বলিয়াই বোধ হয়। “চট্টগ্রামের বিবরণী” নামক

* বালিলার ইতিহাস—প্রথম ভাগ, ২৫ পৃঃ।

† Vide General Phayre's History of Burma P. 18

‡ “থারেখেন্ডর” শ্রীক্ষেত্র কি না, তাহাও সম্বন্ধে বিবরণ। উৎসবন্ধে জেনারেল কেমার বলেন,—

“Thare Khattara is interpreted by Lissan as representing ‘Srikshetra’, the field of fortune. ‘Khattara’ is also the Burmanized form of ‘Kshatriya’ and the name has been interpreted as referring to the race from which the kings of Burma claim to have descended.” P. 11 (foot-note) History of Burma.

আখ্যায় শ্রীহট্টের নামঃ “শ্রীক্ষেত্র”রূপে উল্লেখ থাকি বিচিত্র নহে। কেননা, শ্রীহট্টের মহাপ্রাচীণত্ব দেখা যাইতে পারে—তাহারই নামে ইহা “শ্রী” অর্থাৎ লক্ষ্যের “হট্ট” বলিয়া পরিচিত। সেই কারণে ইহা “শ্রীক্ষেত্র” অর্থাৎ স্থান “খট্টার” উল্লেখিত হওয়াও অসম্ভবিত নহে। “শ্রীহটে হাটকেখরঃ” এই প্রাচীন তত্ত্বের ন্যায় “শ্রীক্ষেত্রে হাটকেখরঃ” এইরূপ আছে। তাহা হইলে “শ্রীহট্ট” বা “শ্রীক্ষেত্র” একার্থবাচক বলিয়াই প্রতীত হইবে।

ক্রমশঃ প্রকাশিত একখানি গবেষণামূলক গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ পাঠে জানা যায় যে, খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতেও ঐ দেশ ‘চাটগাঁ’ বলিয়াই বোধ-জগতে খ্যাত ছিল; এ কথা প্রসিদ্ধ বৌদ্ধভাষাভিজ্ঞ চট্টগ্রামবাসী রায় শবৎচন্দ্র দাস বাহাদুর সি আই ই বলিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চট্টল বা চট্টগ্রাম নামক কোনও রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল, এমন কথা চট্টগ্রামের বিদ্বৎসম্মানে পণ্ডিতা যার না। সম্ভবতঃ ইহা তখন ‘মগ’দের অধীন ছিল। তারপর যদিও তর্কহলে বলা যায় যে, সপ্তম শতাব্দীতেও “চট্টল” নামেই ইহা স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে পরিচিত ছিল, তথাপি “খ্রীচট্টল” এই নামের “খ্রী” কিরূপে আসিয়া চট্টলের মাধ্যমে বসিল। এটা নামের অংশ না হইলে চীন পরিব্রাজক এত কষ্ট করিয়া ইহা লিখিতেন না এবং তৎপশ্চাদ্ভাগে ইচিংও তাহা অব্যাহত রাখিতেন না। ফল কথা, “শিহ-লি-চ-ট-লো” “খ্রীচট্টল” মতে, “খ্রীহট্ট”ই বটে।

ওয়ার্টস স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, সমতটের উত্তর-পূর্বভাগে শিহ-লি-চ-ট-লোর অবস্থান ‘ধারেশ্বরের’ (বা চট্টল) হইতে হইলে “দক্ষিণ-পূর্ব” হওয়া আবশ্যিক ছিল। কিন্তু নানা গ্রন্থ আলোচনা করিয়াও তিনি পাঠ “উত্তর-পূর্ব”ই পাইয়াছেন। তাই তিনি ইহা “ত্রিপুরা জেলা” অন্বেষণ করিয়াছেন এবং তাঁহার টীকা-লেখক ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট এ. দ্বিথ সাহেবও ঐ মতের সমর্থন করিয়াছেন। হুংথের বিষয়, তাঁহার নিকটে গিয়াছেন বাল, ট্রিক স্থানে পৌছিতে পারেন নাই। তবে ত্রিপুরা জেলার এক বিশিষ্ট অংশ (সরাইল পরগণা) সে দিনও খ্রীহট্টের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সরকার খ্রীহট্টের মধ্যে যে মহাল ‘সত্তর খণ্ডল’ (সরাইল) সপ্তদশ শতাব্দীতেও ছিল, তাহা আইন আকবর হইতেই প্রমাণিত হয়।

এখন শিহ-লি-চ-ট-লো ও খ্রীহট্ট হইল,—যখন-চুয়াত্তের বর্ণনার সঙ্গে মিলাইয়া একবার দেখা উচিত। ইহা সমতটের পূর্বোত্তরে, পূর্বতের মধ্যেও বটে; কেন না, ইহার প্রায় তিন দিকেই পূর্বত—খাসিয়া, জয়ন্তীয়া প্রণী হইতে ডান দিকে তুরিয়া, দক্ষিণ দিকে রঘুনন্দনগাহাড় পর্যন্ত একটা পূর্বতের বেটনো খ্রীহট্টের উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণাংশ ঘেরিয়া চলিয়াছে। ইহা সমুদ্রের পার্শ্বে (near the sea) প্রমাণিত করা আবশ্যিক।

প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল, ভাটেরায় দুইখানি তাম্রশাসন পাওয়া যায়; তাহা এশিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র পাঠ করেন। শাসন-প্রদত্ত কৃষি যে খ্রীহট্ট-প্রদেশেরই, তাহা শাসনে “খ্রীহট্টনাথ” শিবের উল্লেখই বুঝা গিয়াছে। তাহার একটিতে

• চট্টগ্রামের বিবরণ, ভৌগোলিক ভাগ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, • পৃষ্ঠা।

† এ হলে এর হতে পারে, খ্রীহট্ট এত আটান কি না? তদন্তের বাহা বক্তব্য, তাহা ইতঃপূর্বে আকবরবীর তাম্রশাসন আলোচনা হ.ল বলিয়াছি—ইপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকা, ১২শ খণ্ড, ১৩ সংখ্যক অবধি (৩১পৃ), অথবা বিদগ্ধ, আবাদ, ১৩২০, অথবা রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিমল-পত্রিকা, সপ্তম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩১১ খ্রীষ্টাব্দ। তদন্তলক্ষে প্রমাণিত করিয়াছি যে, ‘খ্রীহট্ট’ তখনও বন্যামায়াত জনপদরূপে বিদ্যমান ছিল।

‡ Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, No. VIII. August 1880.

জয়গাৰিশেষের পরিচয়ে “সাগরপশ্চিমে” শব্দটি বহিরাছে এবং অপরটিতে “নৌবাটক” শব্দের ব্যয় উল্লেখ আছে। ডাঃ মিত্র তাহার অর্থ কল্পিয়াছেন, “war boat”।

এই শাসনগুলি খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীর বলিয়া লিপি দ্বারা প্রমাণিত হয়, যদিও ডাঃ রাজেন্দ্রলাল জয়োদশ শতাব্দীর বলিয়াছেন। যাহাই হউক, ছয় সাত শত বৎসর পূর্বে খ্রীষ্টের স্থানবিশেষের নিকটে সাগর ছিল এবং নৌবল পবিবক্ষিত হইত, ইহার স্পষ্ট নিদর্শন এই শাসনদ্বয় হইতে পাওয়া যাইতেছে।

এই সাগর মহাসমুদ্রের অংশবিশেষ না হইতেও পারে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে খ্রীষ্টের মধ্য, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগে হাওর সংজ্ঞক যে সকল বিশাল হ্রদ বিস্তৃত আছে, প্রবল বর্ষাকালে, বিশেষতঃ যে বৎসর হঠাৎ জলপ্লাবন হইয়া শতাব্দি নষ্ট হইয়া যায়, সেই বৎসবে, ইহাদের আকৃতি দেখিলে, চৈনিক পরিব্রাজকের কথা যে ১৩০০ বৎসর পূর্বে বর্ণে বর্ণে সত্য, তাহা সহজেই প্রমাণিত হইবে। বর্তমান কালে, দেড় শত বৎসর মাত্র পূর্বে, যখন (১৭৭৮ খৃঃ) মিঃ লিওনে খ্রীষ্টের গবর্নর হইয়া বর্ষাকালে ঢাকা হঠাৎ সওয়ানা হইয়াছিলেন, তখন তিনি লিখিয়াছিলেন,—

I shall not be disbelieved when I say that in pointing my boat towards Sylhet, I had recourse to my compass, the same as at sea, and steered a straight course through a lake not less than one hundred miles in extent।

প্রতি বৎসরে বর্ষায় পলি পড়িয়া অনেক নিম্ন স্থান উচ্চ হইতেছে। আমরা বালাকালে, বর্ষ ৪০।৪৫ বৎসর পূর্বে, যে সকল প্রান্তর অতল-স্পর্শ দেখিয়াছি, তাহা আজ শতক্ষেত্রে

৪ প্রথম শাসন, ৩৮শ পংক্তি।

+ দ্বিতীয় শাসন (১) ১৩-১৫ পংক্তি—

নিঃসীমেনৌবাটকপত্তিরাজিঅতিব্রহ্মাণ্ডলসৈন্তদলপং।

স রাজরাঃ কুম্ভাবকাটৈর্ঘণোভিককর্মা বিঘণীচকার।

(২) ২১-২২ পংক্তি,—

কায়নৌবাটককলিপাতবাভোজলবারিতিকপ্রঃ।

রূপান্তরকৈরতিদলপত্তিঃ সন্তাপশান্তিঃ স্ততয়ানলতিঃ।

১. এক্ষণে যে সমস্ত খ্রীষ্ট সমুদ্র-প্রবর্তিত ছিল, তদ্বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। খ্রীষ্টীয় সাতম লিখিয়াছেন, “The conformation of some of the sandy hillocks and the presence of marine shells at the foot of the hills along the northern boundary indicate that the sea flowed at the base of the hills at a (geologically speaking) comparatively recent period (Statistical Accounts of Assam. Vol. II, p. 263)।”

৭ Extracts from “The Lives of the Lindsay’s Appendix to Hunter’s Statistical Accounts of Assam. Vol. II. P. 346

পরিণত হইয়াছে। তাই তের শত বৎসর পূর্বে খ্রীষ্টীয়াব্দ চীন পণ্ডিতদের নিকট সমুদ্রের সমীপবর্তী বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। ইহাতে বিশ্বের কোনও কারণ দেখা যায় না।*

অতএব দেখা গেল যে, শিহ-লি-চ-ট-লো যে খ্রীষ্ট, তাহা চীন পণ্ডিতের উচ্চারিত নাম-সাদৃশ্যে, তথা তৎকথিত লক্ষণাদিতে, স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে। প্রথমটির সংস্থান সম্বন্ধে যদি আমরা স্থিরনিশ্চয় হইতে পারি, তবেই অন্য পাঁচটির সংস্থান-বিষয় আলোচনা করার সুবিধা হয়। তাই শিহ-লি-চ-ট-লো লইয়া এত বিতর্ক করিতে হইয়াছে।†

২। অতঃপর শিহ-লি-চ-ট-লো-র দক্ষিণ-পূর্বে “ক-মোলংক”; - ইহা সমুদ্রের এক কাঁড়ি উপর অবস্থিত বলিয়া কথিত।

ইতঃপূর্বে বলা হইয়াছে যে, মিঃ ওয়াটাস্ (এবং মিঃ ভিন্সেন্ট স্মিথ্) শিহ-লি-চ-ট-লোকে ত্রিপুরা অঞ্চলে আনিয়াছেন, কিন্তু ক-মোলংক সম্বন্ধে পূর্বতন সিদ্ধান্ত অব্যাহত রাখিয়া লিখিয়াছেন,—“It is said to be Pegu and the Delta of the Irawadi,” অর্থাৎ ইহা পেগু এবং ইবাবতী নদীর ব-দ্বীপ। কিম্বদন্ত্যমতঃ পরম্! যখনচুয়াং পর পর রাজ্য-গুলিব নাম লিখিয়া গিয়াছেন—“ক-মো-লংক” শিহ-লি-চ-ট-লোর অব্যবহিত দক্ষিণ-পূর্বস্থিত হওয়া আবশ্যক। ষাংহায়া শিহ-লি-চ-ট-লোকে “প্রোম্” বলেন, তাংহায়া অবশ্যই ক-মো-লংককে পেগু বলিতে পারেন,—কিন্তু শিহ-লি-চ-ট-লোর বেলায় ভিন্ন ব্যবস্থা করিয়া, ক-মো-লংক

* যখনচুয়াং যে কোন সময়ে সমস্তট পরিদর্শনপূর্বক প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন, ঠিক জানা যায় না। অতঃপর আমরা এইটুকু অনুমান করিয়া নিতে পারি যে, নিশ্চয়ই তিনি বর্ণাকালে সমস্তট হইতে উত্তর-পূর্বভাগে দৃষ্টি বিক্ষেপ করিয়া, অপর তলগাশি দলনে ভদ্রপার্শ্বই জনপদ পরিভ্রমণে হস্তান্তর হইয়াই প্রত্যাবর্তনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। কলতঃ বর্ণাকাল ভ্রমণাপোষী সময়ও নহে; বিশেষতঃ বৌদ্ধ দর্শনিকগণ ষষ্ঠাঙ্কে বর্ণাকাল স্থাপন করিতেন। (Vide Watters' Yuan Chwang Vol I, P 145)

† এ স্থলে অপর চীন পরিব্রাজক ইচিংএর উক্তি উদ্ধৃত করা আবশ্যক মনে করিতেছি। য়়ানচুয়াংয়ের আর ত্রিশ বৎসর পরে ইচিং ভারত-ভ্রমণে আগমন করেন। তিনি বলিয়া হইতে পূর্বাভিমুখে ৪০০ বোজন চলিয়া বৃকসীনাথ প্রদেশে যান। এই প্রদেশের পূর্বপ্রান্তস্থিত বৃহৎ কৃক (Great Black) পর্বতকে তুকন (অর্থাৎ তিব্বত) দেশের দক্ষিণ সীমা বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন। এই পর্বত চীনদেশের সূচুয়ান (Szuchuan) প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে আর এক মাসের পথ ব্যবহৃত বলিয়া তিনি নির্ধারণ করিয়াছিলেন। এই স্থান হইতে দক্ষিণ দিকে সাগর-তীরের সন্নিবর্তন “ইক্সু” নামক জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন [Vide P 9. of Dr. Toka-icasu Itsing]. ইহা যে ‘খ্রীষ্ট’, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। “বৃহৎ কৃক” পর্বত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উত্তর-সীমান্তিত ভেটিয়াই পাহাড় বলিয়াই স্পষ্ট উপলব্ধ হইতেছে এবং তথা হইতে দক্ষিণ দিকে চলিয়া, আদাম ও খাসিয়া পাহাড় পার হইয়া, তৎপাশ্বে সমুদ্র বলিয়া প্রতীত অনুভূতির প্রাচুর্যবর্তী খ্রীষ্ট-রাজ্যেই তিনি পৌঁছিয়াছিলেন। ইচিং অবশ্যই তাংহায়া অব্যবহিত পূর্ববর্তী পরিব্রাজক য়়ানচুয়াংয়ের ভ্রমণবিবরণে পাঠ করিয়াছিলেন এবং বোধ হয়, তিনি খ্রীষ্ট প্রভৃতি স্থানে বাইতে পারেন নাই বলিয়াই ইচিং এই অঞ্চলে দাঁড়িবার প্রস্তাব উৎকর্ষ হইয়া, য়়ানচুয়াং সমস্তট দিগা বেলে “সমুদ্র” পথে পড়িবে, এই আশঙ্কায় ভেটিয়া পাহাড় ইত্যাদি দীর্ঘ ও দুর্গমতর পথ দ্বিরা খ্রীষ্ট উপস্থিত হইয়াছিলেন।

স্থলে সাবেক রায় বহাল রাখা নিতান্তই অসুচিত এবং এটা তথ্যযোব পক্ষে দোষাবহ।
কলত: 'কমোলংক' পেশ নহে, শ্রীহট্টের সংলগ্ন "কমলাঙ্ক", বর্তমানে কোমিলার বাহা পরিণতি
প্রাপ্ত হইয়াছে।

এই জনপদের অপর নামও ছিল—"কম্বাস্ত",* বোধ হয়, ইহা কমলাঙ্কেরই দ্বিতীয় নাম
—যেমন 'ওড়ু' ও 'উৎকল'। বাহা হউক, কমলাঙ্কের নাম অধুনা প্রামাণিক গ্রন্থবিশেষে প্রাপ্ত
হওয়া গিয়াছে এবং এই কমলাঙ্ক যে এতদঞ্চলেরই নাম, তাহাও তদ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে।
পঞ্চাৎ এই রাজ্য ত্রিপুরার অধীন হইয়া উহার সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছিল।†

ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ
দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত কবি ভবানীধারের "ময়নামতীর গানে" নিম্নলিখিত ছোট পংক্তি আছে,—

"বাগের মিরশ এড়ি বাইয়ু গৈবব (গোড়র) সহব।

দাদাব মিরশ এড়ি বাবেক কামলাক নগড় ॥"—(৬পৃঃ, ১৩৩)

এই "কামলাক" যে "কমলাঙ্ক", তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।‡ গৈর বা গোড়
অনতিদূরবর্তী শ্রীহট্টের তৎকালীন নামান্তর; বিখ্যাত শাহ জালাল কর্তৃক ঐ বাজ্যে ধ্বংস-
সাধন হইয়াছিল।

এই ময়নামতীর নামে কোমিলা সহবেব পাঁচ মাইল দূরবর্তী "লালমাই" পাহাড়ের নাম
আজিও "ময়নামতীর পাহাড়" বলিয়া সংজ্ঞিত হইতেছে। ময়নামতী এই অঞ্চলেই লীলা-
ধোলা করিয়া গিয়াছেন এবং তদীয় উক্তিতে যে কমলাঙ্কের উল্লেখ দেখা যায়, তাহা পেশ
হওয়া অসম্ভব।§ বরং বাহা 'কম্বাস্ত' বলিয়া অষ্টম শতাব্দীতে¶ পরিচিত হইয়াছিল এবং বাহা

* "পূর্ববঙ্গের একটি বিস্তৃত জনপদ" শীর্ষক গ্রন্থ (শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী-লিখিত) দ্রষ্টব্য—প্রতিভা,
৩৪ বর্ষ, ১২ম সংখ্যা (চৈত্র, ১৩২০)।

† কমলাঙ্কের কিয়দংশ পালরাজগণের সময় সমতটের সান্নিধ্য হওয়ার প্রমাণও পাওয়া যায়। ত্রিপুরার অত-
পূর্ব বাঘাউড়া গ্রামে প্রাপ্ত বিষ্ণুভূর্তির পাছশীটে খোদিত লিপিতে সমতটের রাজা প্রথম মহীপালদেবের নাম
লিখিত রহিয়াছে। Vide Plate X facing P. 18 of Vol. XI, No 1. 1915. J. A. S. Bengal

‡ ওয়াটস্‌ ও বীদ উভয়েই "কমোলংক"কে "কামলাঙ্ক" বলিয়াছেন; "কামলাঙ্ক" এই অপভ্রংশবাহা
"কামলাঙ্ক"ই প্রকৃত নাম বলিয়া অধিকতর সম্ভাব্য হইলেও 'কমলাঙ্ক' নামটি পৌত্তম্যের এবং বাঙ্গালী লেখকবর্গ
(এবং কি, 'পেশ'বাহারও) একবাক্যে 'কমলাঙ্ক' নামটিই গ্রহণ করিয়াছেন—এই অবশ্যেও তাহাই প্রমাণিত হইল।

§ ব্রহ্মদেশের ইতিহাস পড়িলে কৃত্রাপি কমলাঙ্ক নামে কোনও নগর বা জনপদ ছিল, এমন কিছু পাওয়া যায়
না। সুবর্ণা কলমাবলে এতদ্ব্যুৎপত্তি করা হইয়াছে। যে স্থানটিকে কমলাঙ্ক (বা কামলাঙ্ক) বলিয়া ধরা হয়,
সেই রাজ্যের প্রাচীন নাম ছিল সুবর্ণভূমি এবং রাজধানীর নাম ছিল হরেন্দ্রী। (Vide Phayre's History
of Burma. P. 19 & P. 290) দীন পন্ডিতের এই অঞ্চলের উল্লেখ অভিপ্রায় হইলে, তিনি ঐ সকল নামই
বলিতেন।

¶ ইংগপুর্বে পাহাড়ীকার "পূর্ববঙ্গের একটি বিস্তৃত জনপদ" শীর্ষক গ্রন্থের উল্লেখ করা হইয়াছে—এখানে
যে ভাষা পদবন্ধের কথা আছে, ইংলি নাকি অষ্টম শতাব্দীর বলিঙ্গলিপিবিচারে প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রাচীনতম

বর্তমানে “কোমিল্লা” পরিণত হইয়াছে—“কমলাক” তাহাই বটে। ত্রিপুরার ইতিহাস-লেখক সুগীর কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় নিঃসন্দেহে কোমিল্লা অঞ্চলকেই কমলাক বলিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালার প্রথম মৌলিক গবেষণামূলক ইতিহাস-লেখক ৮/১৯৩৩ খৃঃাব্দে মুখোপাধ্যায়ও তাহাই বলিয়াছেন, যদিও ইহারা কেহই যুক্তি-তর্ক দ্বারা স্বীয় মত স্থাপন করেন নাই। বাহা হউক, কমলাক সন্ধকে সমধিক আলোচনা বাহ্যল্যমাত্র।

পরন্তু এই “ক-শো-লংক” সমুদ্রের কাঁড়ির উপরে প্রতিষ্ঠিত বলা হইয়াছে। বর্ষার জল-প্রাবনের সময়ে মেঘনা নদীর তীরবর্তী স্থান জলমগ্ন হইয়া সমুদ্রোত্তার ধারণ করে। পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের খাত অধুনা ভৈরববাজারেব নিকটে ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরার সীমান্তে আসিয়া মেঘনার পর্যাবসিত হইয়াছে। তেব শত বৎসর পূর্বে এ স্থান সমুদ্রের কাঁড়িই ছিল, এটা অসম্ভব কল্পনা বাটতে পারে। অধুনা নদী বাহিত ও বর্ষার জল-বিধৌত পলিমাটি পড়িয়া বহু স্থানে ৫য় ভরাট হইয়া পড়িয়াছে।

৩। ব্রহ্মচর্য্য-কথিত তৃতীয় রাজ্যের নাম তো-লো-পো-তি; ইহা কমলাকের পূর্বে। এই তো-লো-পো-তি সন্ধক্ষেত্রিঃ ওয়াটাস্ বলেন,—

“*Tolopoti is the city with this name to which Shan-ssai went in order to consult Mahadeva its patron god ... Our pilgrim's Tolopoti has been restored as Darapati and as Dwarapati or Dwaravati 'the Sanskrit name for Ayuthya or Ayudhya the ancient capital of Siam'; but the characters seem to stand for Talapati i.e. Mahadeva.*”

ইহাতে পূর্ববর্তী হরিগণের মত প্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার যে অবোধায় সংস্কৃত নাম বলিয়া “দ্বারাবতী” নির্দেশ করিয়াছেন, সেই অবোধা কোন সময়ে সৃষ্ট হইয়াছিল, সেটা ওলাইয়া দেখিবারও অবসর পান নাই।

It is stated in the History of Siam that king Phra Ramathibodi founded the Capital Ayudhya in A. D. 1350 (vide Bowering's 'Siam' vol. I, P. 43) [Quoted from Phayre's History of Burma, P. 66-foot-note] অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যএর লেখায় ৭০০ বৎসর পরে যে নগরের আবির্ভাব, তাহাই তৎকথিত “তো-লো-পো-তি” দ্বারা এই সকল পণ্ডিত নির্দেশ করিতেছেন। পূর্বেই দেখাইয়াছি, যে,

শাসনস্থানিতে প্রধাণর পিতৃপিতামহের নাম থাকতে পাইই প্রত্যন্ত হর যে, শাসনস্থানবের বর্ষায়ের অবস্টাই শতাব্দীকাল পূর্বে হইতেই তথায় রাজত্ব করিতেছিলেন। ফলতঃ, ব্রহ্মচর্য্যএর সময়ে এই রাজ্যে যে শক্তিশাল ছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।

• Watter's Yuan Chwang, Vol II P. 189.

১. ভাটদেশের প্রাচীন নাম ‘চম্পা’ ছিল বলিয়া ব্রহ্মদেশীয় প্রত্নতাত্ত্বিক টসীন্স কো মহোদয় অনুমান করেন। (vide N. B. Gazetteer, vol. I Part I, P. 205) কর্ণেল সেক্সপীরর ভাটাই বক্তব্যঃ (vide Col. L. W. Shakspear's History of Upper Assam, Upper Burma &c. P. 8) অতএব ‘দ্বারাবতী’ বলিয়া,

ধাবেখেতব চীন পবিত্রাজকেব পবিত্রমণে আসিবার পায় ৬০০ বৎসর পূর্বে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাহাই শিহ্-লি-চ-ট-লো বাবা স্থচিত বলিয়া ইংরা নিৰ্দেশিত কবিত্তেছেন।* কলতঃ এতাদৃশ পণ্ডিতগণেব ঈদৃশ অসমাগুদর্শিতা বড়ই বিস্ময়জনক।

মোট কথা, তো-লো-পো-তি ঐ দিকে নহে—কমলাকেব পূৰ্বদিকে সোজা দৃষ্টিপাত কবিলেই যাহা দেখা যাইবে, সেই “ত্রিপুরা” বা “ত্রিপুরাপতিব” রাজ্যট এই “তো-লো-পো তি” দ্বারা স্থচিত হইতেছে। *

কথা হইতেছে, ত্রিপুরা কি এত প্রাচীন? উত্তর, ত্রিপুরা ঠিক আপেক্ষাও প্রাচীনতর। ত্রিপুরায় একটি অঙ্গ প্রচলিত আছে, সম্রাতি উহাব ১৩২৮ অব্দ চলিতেছে। ১৩২৮ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ৫২০ খৃষ্টাব্দে বৃহনচূড়ায় ভাবতবর্ষ পবিত্রমণে আসিবার প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল পূর্বে এই অঙ্গ প্রবর্তিত হয়। ত্রিপুর নৃপতি দ্বিতীয় বীরবাজ ৫১২ শকাব্দে দিগ্বিজয়-ক্রমে “গঙ্গার পশ্চিম তীরে বিজয়-বৈজয়ন্তী উদ্ভটন কবিয়া” তৎস্মৃতি সংরক্ষণার্থে এই অঙ্গের প্রতিষ্ঠা করেন। হাটোর সাহেব লিখিয়াছেন,—

“The State of Hill Tipperah has a chronological era peculiar to itself. The Dewan reports that it was adopted by Raja Biraraja from whom the present Raja is 92nd in descent. Raja Biraraja is said to have extended his conquest across the Ganges and in commemoration of that event to have established a new era dating from his victory.”

P. 470, Hunter's Statistical Account of Hill Tipperah.

এই বীরবাজেরও পূর্বে বহু রাজ্য রাজত্ব কবিয়া গিয়াছেন। হাটোর নামে ঐ রাজ্য সংজ্ঞিত হইয়াছে, সেই “ত্রিপুর” নৃপতি যুধিষ্ঠিরেব সমসাময়িক বলিয়া রাজমাল্য কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকেন। বীরবাজ ত্রিপুর হইতে অধস্তন ৪৩শ পুরুষ।

অতএব চীন পবিত্রাজকেব নিকটে এই সুপ্রাচীন † প্রভাবশালী রাজ্যেব নামট কীৰ্ত্তিত হইয়াছিল।

এ স্থলে ভ্রামন্যেণে নিৰ্দেশ করা যাইতে পারে না। এ ছাড়া অপর “হারাগতি”র নামও ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে পাওয়া যায়। গণ্ড অয়েলের উত্তরে তৌঙ্গ রাজ্যে এক হারাবতী ওর্গ ছিল, তাহা সোধ হয়, যেই * হারাব প্রথম ভাগে, কি তাহার অর পূর্বে নির্দিষ্ট হইয়াছিল (Vide P 89, Phayre's History of Burma)

* ত্রিপুরার অঙ্গ নামও ছিল—বগেরা ইংকে পুতুন বলিত।—(৩কৈলাসচন্দ্র সিংহের “রাজমালা”, ৩৭ পৃঃ ত্রইবা) তো-লো-পো তি দ্বারা “হলবর্তী” বৃথাইতে পারে; কেন না, ঐইট ও কমলাক অলবরণ থাকায় হলবর্গ পার্শ্ব্য ত্রিপুরার এই নাম বা উপনাম হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

† ৩কৈলাসচন্দ্র সিংহ-প্রণীত রাজমালায় আছে (২য় ভাগ, ১ম অধ্যায়, ৮ পৃষ্ঠায়) যে, “সমুদ্রগুপ্তের লাট-অন্তরঙ্গিণি দ্বাংগল পণ্ডিতে নেপাল, কামরূপ, সমতটের সঙ্গে “ত্রিপুরা” রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব দেখা যায় যে, বর্ত্তীয় ওর্গ শতাব্দীতেও ত্রিপুরা এক উল্লেখযোগ্য রাজ্য ছিল।” [এ স্থলে বলা উচিত যে, ঐ লিপিতে “নেপালকতুপুরাবি” আছে—অনেকে ইহা “নেপাল ও কর্তুপুরাবি” মনে করেন। আমরা মূল লিপি দেখিবার অবসর পাই নাই—অতএব উক্ত ব্যাখ্যায় উল্লেখ করিয়াই নির্ভর হইলাম।]

এই ত্রিপুরা-বাজ্যে ত্রিপুরাবি মহাদেবের সঙ্গে গাঢ় সংশ্লিষ্ট। মহাদেব ঋতুক ত্রিপুরে নিহত হইলে পুন্ড্রীনা রাজ-মহিষা বংশ-রক্ষার্থে মহাদেবের আরাধনা করেন সংস্কৃত রাজমালায় আছে,—

“শিবলিঙ্গনতা ধ্যানাৎ সা বভূব সুগতির্গা।”

—(৬কৈলাসচন্দ্র সিংহের রাজমালা)।

‘তোলোপোতি’ বা তাবাপতি দ্বারা মহাদেব স্মৃতিত হইলে, এই বাজ্যেবই অধিষ্ঠাতৃদেবের নির্দেশ হইয়া থাকিবে। ত্রিপুরায় সতীৰ দক্ষিণ চব্বা পতিত হইয়াছিল, দেবী ত্রিপুরা এবং ভৈরব ত্রিপুরেশ্বৰ অনাদি দেবতারূপে পূজিত। ত্রিপুরা-বাজ্যের প্রাচীন রাজধানী কৈলাসহরের নিকটে উনকোট নামক তীর্থে আজিও অতি প্রাচীন বিবাহট মহাদেব-মূর্তির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। হিতবাদীর সম্পাদক পণ্ডিত ত্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিজ্ঞাবিনোদ মহাশয় সেই স্থানে গিয়া যাহা বর্ণনা কবিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।—

“উনকোট শৃঙ্গের পশ্চিম পার্শ্বে প্রস্তবের অনেকগুলি দেবদেবীর মূর্তির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। × × × এই সকল মূর্তির মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য;—এটি মহাদেবের মূর্তি, উহা অতি প্রকাণ্ড; দুইটি কর্ণ দুইখানি কপাটের দ্বারা দুইখানি চালের দ্বারা দুইটি কুণ্ডল তাহাতে শোভা পাইতেছে। গোপের এক দিক্ ডাক্সিয়া গিয়াছে, এক দিকে এ হাত, কি স্বেদ হাত পরিমাণ বর্জমান আছে। তাতে ত্রিশূল, সম্মুখে দুইটি প্রকাণ্ড বৃষ। × × × × × শৃঙ্গাগ্রে প্রস্তব ও ইষ্টকরাশি প্রকৌর্ণাবস্থায় ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে। কোনও কালে ঐ স্থানে যে প্রস্তব ও ইষ্টক-নির্মিত মন্দির ছিল, তাহা বেশ অস্বপ্নিত হয়।”—শ্রীত্রীযুতেন কৈলাসচন্দ্র পবিত্রমণ, ১৫-১৬ পৃঃ।

এই স্থানের মাহাত্ম্য-স্বাপক প্রাচীন হস্ত-লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থও পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে আছে,—

“বিদ্বাদ্ভ্যঃ পাদসমুত্তো বরবক্রঃ সুপুণ্যদঃ।

দক্ষিণত্যাং নদস্তাত্ত পুণ্যা মহুনদী স্মৃতা ॥

অনয়োবস্তরা বাজন্ উনকোটগিবিম্বহান্।

তত্র তেপে তপঃ পূৰ্ণং স্তম্ভং কপিলো মুনিঃ ॥

তত্র বৈ কাশিলং তীর্থং কপিলেন প্রকাশিতম্।

লিঙ্গক কাশিলং তত্র সৰ্ব্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম ॥

অর্থাৎ এই বাজ্যেব অধিষ্ঠাতা মহাদেব ও তল্লিঙ্গ বহু প্রাচীন এবং চীন পরিব্রাজক এই ত্রিপুরাবাজ্যের কথা শুনিয়া গিয়াছেন, সন্দেহ নাই। এই বিশাল প্রস্তর-নির্মিত মহাদেব-মূর্তি ভগ্নাবস্থায় প্রাচীনত্বের অমোঘ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন।

৪। ‘তো-লো-পো-তি’র পূর্বে যখনচুয়াং ই-শং-ন-পু-লো রাজ্যের উল্লেখ কবিয়াছেন। “ই-শং-ন-পু-লো” দ্বারা “ঈশানপুর” বুঝাইতেছে বলিয়া সকলেই অনুমান করিতেছেন। যেহেতু

তো-লো-পো-তি দ্বারা শ্রামদেশকে নির্দেশ করা হইয়াছে, “ঈশানপুর” দ্বারা তৎপূর্বদিকস্থিত কাঞ্চোডিয়া ধরা হইয়া থাকে।

ই-শং-ন-পু-লো কি, বলিবার পূর্বে তো-লো-পো-তি দ্বারা যে রাজ্য নির্দেশিত হইয়াছিল, সেই ত্রিপুরা-রাজ্যের তৎকালীন বিস্তৃতিবিষয়ে ইহা বলা আবশ্যক যে, সপ্তম শতাব্দীতে শ্রীহট্টের দক্ষিণাংশ, কাছাড়ের পশ্চিমাংশ এবং লুশাই পাহাড় ত্রিপুরা-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহার পূর্বভাগে ই-শং-ন-পু-লো দ্বারা কি স্থিতি হইয়াছিল, এখন তাহার বিচার আবশ্যক।

“ঈশানপুর” অর্থ মহাদেবধ্বাসিত নগর, ইহা কাঞ্চোডিয়া অঞ্চলে হইতে পারে কি না, তাহা বিবেচনা করিবার সময়ে সর্বান্যদো দেখা আবশ্যক, ঐ অঞ্চলে শৈব ধর্ম ভূরি প্রচলিত ছিল কি না? এ সম্বন্ধে কাঞ্চোডিয়ার ইতিহাসে কোনও স্পষ্ট প্রমাণ আছে বলিয়া বোধ হয় না। ইহার সংস্কৃত নাম কঞ্চোজ, এইমাত্র জানা যায়। এমনত অবস্থায় কাঞ্চোডিয়া অঞ্চল কিরূপে ঈশানপুর হইতে পারে?*

ফলকথা—সে দিকে দৃষ্টিপাত নিবর্থক। ত্রিপুরা-রাজ্যের পূর্বভাগে—ত্রিপুরা ও ব্রহ্মদেশের শান রাজ্যের মধ্যে যে জনপদ অবস্থিত, “ইশংনপুলো” দ্বারা তাহাই স্থিতি হইয়াছে। ভূবন পাহাড়স্থিত ভূবনেশ্বর তীর্থ ঐহাবা দেখিয়াছেন, তাঁহাবা তত্রত্য প্রস্তর-নির্মিত স্তম্ভাবয়ব দেবমূর্তিগুলি এবং পাহাড়ের গায়ে খনিত গুহাগুলি দেখিয়া ইহা স্পষ্ট বৃত্তিতে পারিয়াছেন যে, ইহা একটা সম্ভা জনপদ-মধ্যস্থিত দেবতা-স্থান ছিল, যে স্থানে ঋষিকল্প সাধকগণ আসিয়া, দেবতা-দর্শনান্তে গুহামধ্যে বসিয়া, ইষ্টদেবতার ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। এই ভূবন পাহাড়ের মূর্তিগুলি দেখিলে স্পষ্টাচান বলিয়া ধারণা জন্মিবে। উনকোটী তাঁথের মূর্তি বিশেষের সামান্য বর্ণনা ইতঃপূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে—ভূবন পাহাড়ের মূর্তিগুলিও প্রায় তাদৃশ। আজ

* ওয়াটস সাহেব^১তঃ বিঃসন্দেহে ইশংনপুলোকে “ঈশানপুর” করিয়া, কাঞ্চোডিয়া বলিয়া প্রচার করিলেন। কেয়ার সাহেব^২কৃত ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে (২২ পৃষ্ঠা) যুয়নচুয়া-কথিত এই সকল রাজ্য সম্বন্ধে একই আলোচনা আছে। ইশংনপুলো ও কাঞ্চোডিয়া সম্বন্ধে লিখিত আছে,—Beyond that (Tolopatli) still east Tsanapura (T=I?) is not recognizable but still further east Mahachampa mentioned by the pilgrim represents beyond doubt the ancient kingdom of Cambodia. See paper by Mr. James Fergusson in the Journal of the Royal Asiatic Society, Vol. vi, N. S. 1873.

আমরাও মনে করি যে, ইশংনপুলো এ ব্যবক নির্ণীত হয় নাই। কাঞ্চোডিয়াকে “ঈশানপুর” কেম বলা হইয়াছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান জানা যায় যে, সপ্তম শতাব্দীর আরম্ভে ঐ স্থানে ঈশানবর্মা নামে এক রাজা ছিলেন। এই প্রমাণ কি প্রচুর হইল? ঈশানবর্মা নিজ নামে কোনও পুর স্থাপন করিয়াছিলেন কি না, আশে তাহা প্রমাণ করিয়া, এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা উচিত ছিল। বস্তুতঃ এই বিষয় এ পর্যন্ত কাল অসীমায়িত বলিয়া ধরা হইবে।

† স্থানীয় ভাষায় এইগুলির নাম “রথ” (রথ পথের অপভ্রংশ)। কেহ কেহ শব্দটির বাবান “রথ” করিয়া অর্থের ভুলভা নস্পাদন করিয়াছেন।

কুড়ি বৎসর হইল, ঐগুলি দেখিয়াছিলাম এবং বৃত্তিগুলির নিৰ্দ্ধারণ-সৌষ্ঠব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। কিন্তু তাহাব প্রায় সমস্তগুলিই ভগ্ন, লোকে বলে—কালাপাহাড় কর্তৃক বিধ্বস্ত। কিন্তু এই কালাপাহাড় ষোড়শ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ মোসলমান সেনানী নহে। আমার বিশ্বাস, নাগা, কুকি প্রভৃতি যে সকল অসভ্য জাতি এই জনপদের পার্শ্বে আজিও বস্তুমান আছে তাহারাই রাজ্য সহ প্রতিমাগুলিবও ধ্বংস সাধন করিয়াছে।

এই ভূমি পাহাড় ত্রিপুরা-রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল বলিয়া বোধ হয় না। এই পাহাড় যে পূর্বপ্রদেশীয় পশ্চিমাংশে বস্তুমান, সেই পৰ্ব্বতমালারই পূর্বভাগের পাদদেশে একটি প্রাচীন জনপদের সংবাদ মাত্র পাওয়া যায়। তাহার রাজধানী ছিল “বিষ্ণুপুর”। অধুনা যে স্থানের নাম “বিষ্ণুপুৰ”, তাহা পবিদর্শন কবিবার স্মৃতি ১৩২৩ সালে মণিপুর গিয়াছিলাম। ইহা এক্ষণে পাহাড়ের নিম্নে প্রায় সমতল ভূমির উপরেই অবস্থিত। বস্তুমান রাজধানী ইক্ষালে আসিবার পূর্বে মণিপুৰেব অধিপতিগণ এই বিষ্ণুপুৰেই অবস্থান করিতেন। স্থানীয় প্রবাদ এই যে, বস্তুমান বিষ্ণুপুৰেব কিঞ্চিৎ উচ্চভাগে প্রাচীন বিষ্ণুপুর অবস্থিত ছিল, তন্ময় পাহাড়ের চাপে লোকজন সহ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। ১৩০৪ সালেব ভূকম্প বাহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাদের নিকটে এই ঘটনা খুব সম্ভবপৰ বলিয়াই বোধ হইবে।

বিষ্ণুপুৰেব সংস্থান-ভূমি দেখিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, জায়গাটি রাজধানী হইবার উপযুক্ত। এ স্থান হইতে সমগ্র মণিপুৰ উপত্যকা একখানি ছবির স্তায় দৃষ্ট হয়। অথচ ক্রোশখানেক গেলেই প্রকাণ্ড লোণতাক্ হ্রদ; ইহার চারি পার্শ্বেব ষাণ্মুখ্যে মণিপুৰকে শস্ত সম্পদে সমৃদ্ধ করিয়াছে। এই বিষ্ণুপুর মণিপুৰের মধ্যে একমাত্র স্থল—বাহার নাম আৰ্য-ভাষায় আখ্যাত;—অবশ্য “মণিপুর” নামটি মহাভাষতের বলিয়া এ স্থলে গণ্যীয় নহে। বিষ্ণুপুৰেব নাম মণিপুৰাবা “মায়ান” রাখিয়াছে, ইহার প্রকৃতিগত অর্থ (মি-ইরাং) “অনেক লোক” অর্থাৎ জনাকীর্ণ স্থান; এধন “বিদেশী” অর্থে মায়ান শব্দ রূঢ় হইয়াছে। তাহাব কাৰণ বোধ হয় এই যে, এই আধুনিক অনাৰ্য-বহুল জনপদের ভিত্তরে বিষ্ণুপুর একমাত্র আৰ্যবসতিস্থান ছিল।

যুন্নুচুয়াঙের সময়ে এই জনপদের অস্তিত্ব অবশ্যই ছিল, তবে তৎসাময়িক কোনও ইতিহাস পাওয়া দুর্ঘট। শান দেশের বিবরণীতে পাওয়া যায় যে, ৭৭৭ খৃষ্টাব্দে (অর্থাৎ চীন পরি-ব্রাজকের ভ্রমণের ১৫০ বৎসর পবে) পোং রাজ্যের অধিপতির ভ্রাতা শামলং মণিপুৰে আগমন করিয়াছিলেন। ব্রাউন সাহেব লিখিয়াছেন;—

“By a Shan account of the Shan kingdom of Pong considered authentic, it appears that Shamlong brother of the Pong king in returning to his own country from Tipperah (A. D. 777) descended into the Manipur Valley to Mourang the chief village of the tribe of that name.”

ইহাতে অবশ্যই বিষ্ণুপুর বিষয়ে কিছুই প্রমাণিত হয় না। তবে মণিপুর অঞ্চল যে তখন নানা-জাতি-অধ্যুষিত জনপদ ছিল, তাহা দেখা যায় এবং তন্মধ্যে এই বিষ্ণুপুরই বোধ হয়, আৰ্য্য-সভ্যতার আলোকবর্তিকা হস্তে লইয়া বর্তমান ছিল। এখনও বিষ্ণুপুরেব যে সকল অধিবাসী আছে, তাহাদের ভাষা আৰ্য্যগন্ধি। ডাঃ গ্রিয়ার্সন লিখিয়াছেন,—

"A tribe known as Mayang speaks a mongrel form of Assamese spoken by the same Tribe * *. they are also known as Bishnupuriya Manipuris. I have said above that Mayang is a mongrel form of Assamese, it can with equal (or perhaps more) justice be classed as a form of eastern Bengali. The language possesses characteristics of both the languages, but at the same time differs widely from both. * * * In the Manipur State the headquarters of Mayang are two or three plain villages near Bishnupur (locally known as Lamangdong) 18 miles to the south-west of Imphal."*

এই মণিপুর উপত্যকার ভিতরেও প্রাচীন হিন্দু-প্রভাবের আরও একটা পাওয়া যাইতেছে। মেরিডেন্সির প্রাঙ্গণে কতকগুলি প্রস্তরমূর্তি এক প্রকাব অরক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। তন্মধ্যে একটি বৃহত্তরু মহাদেবের মূর্তি এবং দু'একটি হনুমান ও গরুড়মূর্তি দেখিয়াছি। এগুলি মণিপুরের নানা স্থান হইতে নাকি সংগ্রহ করা হইয়াছে।† আমার দেখা এই সকল মূর্তি ছাড়াও অপর মূর্তির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

মণিপুর হইতে জনৈক বন্ধু লিখিয়াছেন,—“ইক্ষ্বাকের ৩২ নাইল দক্ষিণে খুমডাম্ মাসুম্ নামক স্থানে পাহাড়ের উপর অতি প্রাচীন কাল হইতে মহাদেবের এক শিলামূর্তি বিদ্যমান আছে। ঐ মূর্তির সুগভীর নাভিমণ্ডল ও প্রশস্ত উদর বর্তমান। স্বর্গীয় চন্দ্রকান্তি মহারাজ ঐ স্থান খুঁড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিয়ে বুধের মূর্তি দেখিতে পাইয়া খুঁড়ান বন্ধ করেন।”

শৈব ধর্ম ও মহাদেবমূর্তি-পূজা বহু প্রাচীন কালের পরিচায়ক।‡ অতএব এ স্থলেরই কথা যুন্নচুরাঙের বিদিত হওয়া সম্ভব। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, “ইশংনপুলো”কে “বিষ্ণুপুর” বলিয়া অনুমান করা যায় কিরূপে? বিষ্ণু শব্দটিকে সংজ্ঞার্থে ব্যবহারে প্রায়ই “বিষণ”রূপে পরিণমিত করা হয়। সরকারী কোনও কোনও মানচিত্রে এই বিষ্ণুপুরকে “বিষণপুর” লেখা

* Grierson's Linguistic Survey of India Vol. V Part I p. 419 [লাবার ভোগ শব্দের অর্থ উচ্চ খোল্যু-হান—ইহা বিষ্ণুপুরের বিশেষণ।]

† সম্ভবতঃ এই সকল মূর্তি মণিপুরেই প্রস্তুত হইত। আরিও বিষ্ণুপুরে ঐশ্বকল প্রাচীন শিলা-শিল্পীর বংশধর-ণ্য বর্তমান থাকিয়া প্রস্তরমূর্তি নির্মাণ করিতেছে। কিন্তু হার, প্রাচীন কালের মূর্তিগুলির সৌষ্ঠব আর ইদানীং দেখা যায় না।

‡ এ স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, মণিপুর অঞ্চলে বাবাইধবীর যে অতি প্রাচীন গরুড় বাঘ, তাহারও মারক-কাথিকা নিম্ন-লিখিত স্থান বলিয়া সম্বন্ধিত।

হইয়াছে। এই আশ্রয় “ব”টি আবার অন্তঃস্থ (ইংরেজীতে যাকে বলে “সেমি ভাউয়েল”), ইহা ‘u’ (ডব্লিউব) মতন উচ্চারিত হইত। অতএব বিষ্ণুপুং = বিষণপুং = ইষণপুং এইরূপ আকৃতি ধারণ খুবই স্বাভাবিক। কলকথা, ত্রিপুরা ও ব্রহ্মদেশের মধ্যবর্তী এই অঞ্চলই ‘ইশংনপুলো’ দ্বারা সূচিত হইয়াছে।

৫। “ইশংনপুলো” হইতে পূর্বভাগে “মো-হ-চন্ পো”- ইহা “মহাচম্পা” বলিয়া অনুদিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা আনাম ও কোচান চান সূচিত হইয়াছে বলিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকগণ অনুমান করেন। “চম্পা” বলিতে অনেক দেশকেই বুঝায়। ভারতবর্ষে অঙ্গদেশের বাজধানীর নাম ‘চম্পা’—যখনচুয়াং নিজেও ইহা দেখিয়া গিয়াছেন।† কোচান চীন অঞ্চলের নামও ‘চম্পা’ ছিল—মহাচম্পা ছিল কি না, ঠিক বলা যায় না, অততঃ ‘এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা’র প্রদত্ত কোচান চীনের ইতিহাসে “এম্পায়ার অব চম্পা” এই কথাই আছে, মহাচম্পা নাই। সম্ভবতঃ এই “মহাচম্পা” দ্বারা যখনচুয়াং ও চম্পা মাত্রই বুঝাইতেছেন। কেবল অঙ্গদেশের চম্পা এবং হয় ত অতীত ‘চম্পা’ হইতে পৃথক্ কবিবার জন্ত নামের পূর্বে “মহা” প্রয়োগ করিয়াছেন এবং ইহা খুব সম্ভবতঃই হইয়াছে। আজিও গ্রেট-ব্রিটেনের বাহিবে ব্রিটিশ আধিপত্য ব্যতীত আরও জন্ত ‘গ্রেটার ব্রিটেন’ (Greater Britain) বলা হয়।

‘ইশংনপুলো’কে কাথোডিয়া ধবিলে, আনাম কোচানচান পূর্বাঙ্গবর্তী হওয়াতে, ঐ ভূভাগকেই ‘মোহচনপো’ বলিয়া নির্দেশ করিতে হইবে। কিন্তু মণিপুর উপত্যকা ও তৎপার্শ্ব পার্বত্য ভূভাগ ‘ইশংনপুলো’ বলিয়া সীমাস্থিত হইলে, এই ‘মোহচনপো’কে কোথায় অনুসন্ধান করিতে হইবে, দেখা যাউক।

‘ইশাশনপুং’ই যদি যখনচুয়াংয়ের অভিপ্রেত হয়, তবে এমনও হইতে পারে যে, এই জনপদেরই ঐ নাম ছিল। ইশাশনপুংের দুই অর্থ—এক মহাদেবীস্থাপিত পুর, অপর পুরোত্তর কোণবর্তী নগর, ত্বম পাণ্ডুর বা গুম্ভাম্মানুস্মৃতিত মহাদেবীর অধিষ্ঠান হেতু অথবা সমতটাদি অশ্রবিত্ত রাজ্যের ঐশানকোণ-বর্ত্তিভূমি ঐ অঞ্চলেরই উক্তরূপ নাম হওয়া বিচিত্র নহে। তারপর হয় ত ঐশানপুং কালক্রমে “বিষণপুং” বা বিষ্ণুপুংে পরিণত হইয়া যাঁতে পারে।

† কাছাড়ের বানে স্থানে, বিশেষতঃ পুখাংগে বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি ভূষিত হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সাধারণের বিশ্বাস, এগুলি ত্রিপুরার অধিকারের পরিচায়ক। কিন্তু তাহা প্রব সত্য বলিয়া মানিতে পারি না। চীন পরিব্রাজক যাহাকে ‘ইশংনপুলো’ বলিয়াছেন, সেই রাজ্যেই এই সকল পরিচরণরূপ বলিয়া বোধ হয়। কাছাড়ের অংশবিশেষ যে ত্রিপুরারাজ্যের অন্তর্গত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ঐ রাজ্যের পূর্বসীমা কত দূর ছিল, নিঃসন্দেহে বলা যাউতে পারে না, অথচ অরোণ শতাব্দী পূর্বে যে এই অঞ্চল ত্রিপুরার অধীনে ছিল, তাহারও প্রমাণ দুর্ব্বল। ১০ খ্রিস্টাব্দে রাজ্যটি যেমন ত্রিপুরার কক্ষিগত হইয়াছিল, এখানেও সেইরূপ কিছু কইরা থাকিতে পারে।

‡ Watters' Yuan Chwang, vol. II, p. 181

৬ পূর্বোক্তভাবে ‘চম্পা’ নামটির খুব প্রসার ছিল—আম এবং কাথোডিয়াও ‘চম্পা’ সংজ্ঞার দাবিদার, ইহা পূর্বে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু অরোণ শতাব্দী পূর্বে এগুলির এই নাম ছিল কি না, সন্দেহের বিষয়।

ব্রহ্মদেশের ভামো বর্তমানে একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এই ভামোর উত্তরাংশে সাম্পেনগো (Sampenago) নামক এক অতি প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ আজিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই ‘সাম্পেনগো’ চম্পানগরের (ব্রহ্মদেশীয় ভাষায়) অপভ্রংশ। এই চম্পানগর কত প্রাচীন, তাহা বলা যায় না, প্রবাদ আছে যে, পটিলিপুত্রের ধর্ম্মাশোক চম্পানগরে পাগোঁড়া, জলাশয়, কূপ ও পাহুনিবাস সংস্থাপন করেন। কেন না, এখানে নাকি বুদ্ধদেব পূর্বজন্মে কাকরূপে বাস করিয়াছিলেন।* কথা হইতে পারে যে, এই ‘চম্পানগর’ চীন পরিব্রাজকের সময়ে ছিল কি না। তদ্বিষয়েও শানদের কাগজ-পত্র হইতে ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় যে বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে আছে যে, ৪০০ ব্রহ্মাব্দ (মণী) অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ১০৫৮ অব্দ পর্য্যন্ত চম্পানগরে শানবংশবিশেষ বাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।†

যাহা বুদ্ধের পূর্বজন্মবিশেষের লীলাভূমি, যাহাতে ধর্ম্মাশোকের নিৰ্ম্মিত দেবালয়াদি ছিল, তাহাই খুব সম্ভব, বৌদ্ধ পরিব্রাজক য়ুন-চুয়াং কর্তৃক উল্লেখিত হইয়া থাকিবে। পূর্বোপ-
দ্বীপের নানী চম্পাব মধ্যে ইহা যে প্রাচীনতম, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই সম্বন্ধে আমরা আব একটি কথা বলিতে সাহস্য হইতেছি। য়ুন-চুয়াং যে ভাবে চম্পা শব্দটির বর্ণবিজ্ঞাস করিয়াছেন, তাহা লক্ষ্যের বিষয়। চম্পা—‘চান্ পো’—শান দেশের পোং রাজ্যের নামটি স্মরণ করাইয়া দেয় নাকি? শান ভাষা একাক্ষরী (monosyllable), কিন্তু ইহাতে পালি ভাষার সংমিশ্রণ বহিয়াছে।‡

ইহাতে যিনি বাহাই বুন, আমাদের বোধ হয়, প্রাচীন কালে ব্রহ্মদেশের চম্পা রাজধানীব কোনও উপনিবেশকারী সম্প্রদায় কর্তৃক সভ্যতালোক ঐ দেশে নাকি হইয়াছে এবং তাঁহাবা

* The reason for Asoka's choosing Sampenago for one set of his pagodas, tanks etc. is said to be that Buddha had lived there in a former existence in the body of a crow (Extracts from Mr Ney Elias' Introductory Sketch of the History of Shans—p. 58, Vol. 1, Part II, of the Gazetteer of Upper Burma and Shan States)

† From a Burmese translation of an old Shan document which tells the history of ‘Sampenago’, it appears that Sektu Min's successors continued to rule in Sampenago till the time of Sawbwa Thakyabin in 400 B. E. (1038 A. D.) p. 57 vol. I, part II, Upper Burma and Shan States Gazetteer

‡ আমাদের এইরূপ অনুমান যে সম্পূর্ণ উদ্ভূত, তাহা বলিতে পারি না। নয়টি শান রাজ্যের মিলিত নাম ‘কোশানপিয়া’ (Koshanpyi)। উত্তরব্রহ্ম গেজেটিয়ার সম্পাদক স্যার সাহেব ইহা ‘কোশাবী’ নামের অপভ্রংশ বলিয়া অনুমান করেন (N. B. Gazetteer, Vol. I, part I, p. 18৩) কো=নয় (৯) এবং শানপিয়কে চম্পার অপভ্রংশ মনে করিতে পারা যায় না কি? ‘মৌ-শান’ একটি সংস্কৃত পাণ্ডুর্য্য বাক্য—ইহা ‘মহাচম্পার’ অপভ্রংশ বলিয়া ধরিতে পারি নাকি? [The term ‘Mau shans’ is a political rather than social name. p. 190, N. B. Gaz., vol. I, Part I] কলকাতা প্রভৃতিতে অনুমানের এসব খুবই আছে।

§ Shan language is described by Dr Cushing as a monosyllabic language but has polysyllabic words of Burmese & Pali origin (Bhamo Gazetteer, p. 28)

চম্পানগৰ সংস্থাপন কৰেন। বলা আবশ্যক যে, সাম্পোনগো বা চম্পানগৰ এই শান অঞ্চলৰ অঙ্গীভূত ছিল।*

৬। সৰ্ব্বশেষ 'ইয়েন-মো-ন-চৌ'—মোংচম্পোৰ দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে উল্লেখিত হইয়াছে। ইহা এ পৰ্য্যন্ত নিৰ্দ্ধাৰিত হইতে পাবে নাট।†

একণে দেখা যাউক, আমাদেব মতামুসাৰে তাহাৰ কোন ঠিকানা হইতে পারে কি না। ব্রহ্ম-বাজগণের চিঠি-পত্রে তাঁহাদের উপনামেব মধ্যে একটা উপাধি ছিল—তম্বুদীপের অধিপতি, এই তম্বুদীপ সম্বন্ধে উক্ত-ব্রহ্ম প্রদেশের গেজেটিয়ার সকলনকারী স্বট সাহেব লিখিয়াছেন,—“আভা নগরীর দক্ষিণবর্তী সমগ্র প্রদেশের সংজ্ঞা ছিল তম্বুদীপ।‡

‘তম্বুদীপ’ জম্বুদ্বীপের অপভ্রংশ বলিয়াই স্পষ্টতঃ অনুমিত হয়। ‘ইয়েনমোনচৌ’ দ্বারা এই জম্বুদ্বীপই সূচিত হইতেছে। কেন না, চৌ অর্থ দ্বীপ এবং ‘ইয়েনমোন’ জম্বু শব্দের বিকৃতি বলিয়া ধরিতে পারি। বলা বাহুল্য, বৌদ্ধ-মাহিত্যে “ভাবতবর্ষ” সৰ্ব্বদাই “জম্বুদ্বীপ” নামে আখ্যাত হইত এবং ব্রহ্মরাজও বোধ হয়, নিজ বাজ্যাংশেব এই নামকরণ করিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন।

এই ব্রহ্মরাজ্য, সাম্পোনগো (ভামো) সম্বন্ধিত শান-বাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। অতএব বাহা পূর্বে অমীমাংসিত ছিল, তাহারও দেখা যায় যে, এইরূপ একটা মীমাংসা হইয়া যায়।

কথা হইতে পারে যে, এই ব্রহ্মরাজ্য য়ুন-চুয়াঙের সময়ে বর্তমান ছিল কি না? তাহা যে খুব বিশিষ্ট ভাবেই ছিল, ইহারও একটা বেশ অবাস্তব প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া বাইতেছে। যে “মণী” সম এখনও চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত, তাহা ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ পুগসা কর্তৃক

* Anderson describes Bhamo as forming an integral portion of the ancient Shan Kingdom of Pong. This theory was based on the researches of Captain Pemberton who derived his information from Shan manuscripts at Manipur (Bhamo Gazetteer: p. 13) এহলে একটি কথা উল্লেখ যোগ্য, পোংরাণ্য নিহন্ত আধুনিক নহে From Shan manuscript Chronicle the kings are recorded from 80 A. D. (Upper Burma Gazetteer Vol. I, part I, p. 235)

† ‘Yen Mo Na Chau is evidently for ‘Yamanadwipa’ but no probable identification has yet been proposed, for it cannot possibly have been the island of Java. Watters’ Yuan Chwang, Vol II p. 189.

‡ From the translation of a letter dated 21st October 1879, from the Burmese Government to the Governor General of India the style of the king is the Burmese Sovereign of this Rising Sun who rules over the country of Thuna Paranta and the Country of Tamba deepa”

N. B. Gazetteer, Vol. I, part. I, Chap. III, p. 163 (গেজেটিয়ার সকলবিভাগ সি: ‘স্বট তম্বুদীপ’ সম্বন্ধ লিখিয়াছেন :—Thuna Paranta, the Aurea Regio of Ptolemy, all countries to the north of Ava; Tambadeepa, all countries to the south of Ava.)

প্রবর্তিত হইয়াছিল।* মনে রাখিতে হইবে, যে-সে ব্যক্তি অক্ষ-প্রবর্তক হইতে পারে না এবং একটা অরক্ষণীয় যুগেই অন্ধের সৃষ্টি হইয়া থাকে। অপিচ ঐ ৩৩৮ খৃষ্টাব্দে চীন পরিব্রাজক য়ুন-চুয়াং ভারতবর্ষে অধ্যয়ন ও পর্যটনে ব্যাপৃত ছিলেন। মহারাজা-ওয়ার অর্থাৎ মহারাজ-বংশ নামধেয় গ্রন্থে ব্রহ্মদেশীয় বাজগণের ইতিহাস প্রাচীন কাল হইতে ধারাবাহিক-রূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহাতেও এই রাজ্যের উল্লেখ-যোগ্য একটিত হইতেছে। কলকাতাঃ য়ুন-চুয়াং ইহারই বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এ স্থলে বলা আবশ্যিক যে, এই ব্রহ্মরাজ্য তখন বহু বিস্তৃত ছিল; চট্টগ্রাম অঞ্চলও সম্ভবতঃ তৎকালে ইহার অন্তর্নিবিষ্টই ছিল। এইরূপে সমতট-হইতে পূর্বাঞ্চল দিক হইতে আরম্ভ করিয়া উল্লেখযোগ্য রাজ্যগুলির নামোল্লেখপূর্বক চীন পরিব্রাজক চক্রাকারে ঘুরিয়া, পুনশ্চ সমতটের নিকটে পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছিয়া, এখানেই নিরন্তর হইতে বাধ্য হইয়াছেন।

আমারি প্রবন্ধ শেষ হইল। উপসংহারে এইমাত্র বক্তব্য যে, প্রবন্ধের যুক্তি-তর্ক সমস্তই খুব সমীচীন এবং প্রত্যাবহ না হইতে পারে এবং যে সকল সিদ্ধান্তে পৌছা গিয়াছে, তাহাতেও ভ্রম থাকিতে পারে। কিন্তু ইহা দ্বারা যদি প্রত্নতাত্ত্বিকগণের দৃষ্টি আকান, পেগু, শ্রাব, কাষোড়িয়া, আনাম-কোচীন-চীনের দিকে না গিয়া, ত্রিহট্ট, কোমিল্লা, ত্রিপুরা, মণিপুর, শান, ব্রহ্মের দিকে পত্রাবর্তিত হয়, তাহা হইলেই আমার সংকল্প সিদ্ধ হইল, মনে করিব। এই দেশগুলির প্রাচীন তথ্য আজিও সম্যক উদ্ঘাটিত হয় নাই—প্রত্নতত্ত্বাত্মসন্ধারিবর্গ অল্প পর্য্যন্ত এতদ্বকলে থাকিয়া, শিলামূর্তি, প্রাচীন পুথি ইত্যাদি দেখিয়া তথ্যাবিকারের চেষ্টা অতি অল্পই করিয়াছেন। অথচ এই ভূভাগও অতি প্রাচীন এবং এই দিক দিয়াই আর্য্য-সভ্যতা পূর্বভূমিপথে—আমাদের বৃহত্তর ভারতবর্ষে লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে। ব্রহ্মদেশের ইতিহাস-লেখক কেয়ার সাহেব স্পষ্টই লিখিয়াছেন;—

* Vide Appendix A—Chronology (p. 203) of "Burma" by Max & Bertha Ferrar, পরন্তু ব্রহ্মের প্রত্নতাত্ত্বিক মিঃ ট-লীন্-কো (একবারি চিঠিতে) লিখিয়াছেন যে, বর্তমান ব্রহ্ম (মণি সত্ৰ) "পুগান" রাজ্যের অধিপতি থিলাপ্পা কর্তৃক প্রবর্তিত হয় বলিয়া তদদেশীয় ইতিহাস-লেখকেরা নির্দেশ করেন। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩৩ বৎসর হইতে বোধক্স গণিত হয়; তাহা হইতে ১১৮২ বাহ দিয়া এই (মণি) সন আরম্ভ করা হইয়াছে। তিনি এই পুগান-রাজ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"The native writers aver that Tampa dipa (তিনি ইয়াই Tambu-deepa (তম্বুরীপ) এর বিস্তৃত বানান বলেন) is the name applied to a Pagan which is situated on the left bank of the river Irawaddy and that Suna Paranta (সুনা থুনা পারান্টা) is applied to a place opposed to Pagan on the right bank of the same river, and they are inclined to ascribe their foundation to the time of the Buddha." মিঃ ট-লীন্-কো এই সকল "নেটিভ" ইতিহাস-লেখকের উপরে তেমন আধাবান্ না হইতে পারেন, তথাপি আমাদের বহুই প্রয়োজন, তাহা উপরি উক্ত লেখা হইতে নিঃসন্দেহে পাওয়া যাইতেছে। য়ুন-চুয়াংয়ের সময়ে পুগান-রাজ্যের এই অংশ উল্লেখযোগ্য রাজ্য ছিল—এবং "তম্বুরীপ" বা তম্পুরীপ (আমাদের বহু সংস্কৃত লব্ধবীপ) নামক ছিল—যাহা চীন পরিব্রাজক ইয়েন্-ঘো-না-চৌ-বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

The route by which the Kshatriya Princes arrived is indicated in the traditions as being through Manipur which lies within the basin of the Irrawadi. The northern part of the Kube valley which is the direct route of Manipur towards Burma is still called Maurya or Maurira said to be the name of the tribe to which King Asoka belonged.*

আমরাও মনে করি যে, চীন পরিব্রাজকও ঐ পুরাতন পথের দিক্ দিয়াই তাঁহার পরিদৃষ্ট রাজ্যবটকের নাম পর্যায়ক্রমে লিখিয়া গিয়াছেন। দক্ষিণ দিকে তিনি দৃকপাতও করেন নাই। ফলতঃ পার্শ্বস্থ সংলগ্ন গ্রীহট্ট কমলাক প্রভৃতি ছাড়িয়া তিনি সবিৎ-সাগর-ভূধর-ব্যবহিত প্রোম, পেগু ইত্যাদির উল্লেখ করিয়াছেন, এটা অতীব অসম্ভাবনীয়।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্মা

“শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে” সংশয়

১। দুই বৎসর হইল, সাহিত্য-পরিষৎ “শ্রীকৃষ্ণকীর্তন” প্রকাশ করিয়াছেন; আমাদের চির জ্ঞাত চণ্ডীদাসের প্রতিযোগীও সঙ্গে সঙ্গে উপস্থাপিত হইয়াছে। না ভাবার, না ভাবে উভয়ের সাম্য আছে। আছে কিন্তু কবির উপাধি চ-ণ্ডী-দা-সে, ও ব-ড়ু বিশেষণে, এবং উপাত্ত দেবী বা-শ-লী নামে।

“কৃষ্ণকীর্তন” গ্রন্থখানা কিন্তু অপূর্ণ। উহার প্রকাশও অ-পূর্ণ। যামের বাবু সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার নায়ক। তিনি উহা ব মুখবন্ধ লিখিয়াছেন। রাখাল-বাবু প্রত্নবিৎ; তিনি উহার লিপিকাল নির্ণয় করিয়াছেন। আর, এত পণ্ডিত পুথী-সংস্করণে সাহায্য করিয়াছেন যে, তাঁহারিগের নাম ছাপিতে পাতাব এক পিঠ ভবিয়া গিয়াছে। এ সকল ব্যতীত বিদ্বদ্বল্লভ স্বয়ং বসন্ত-বাঁবু গ্রন্থসংস্কারক। তিনি প্রাচীন ও নবীন ভাষায় তাঁহার অশেষ জ্ঞান ঢালিয়া দিয়াছেন। আকাজ্ঞা মিটাইয়া পরিশ্রম করিয়াছেন। শব্দ-সূচী নিশ্চয়দ্বারা ভাষাভেদীয় ধ্বন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। দেখুন, সংস্কৃত আয়ুর্কদের বাদালা অম্ববাদ ছাপা হইয়াছে। কিন্তু একখানিরও শব্দ-সূচী নাই। এই এক উদাহরণে বুঝিবেন, বাদালা পুথীখানার ভাগ্য কেমন প্রসন্ন ছিল।

এ দিকেও দেখুন। সংস্কারক লিখিয়াছেন, (১) “চণ্ডীদাস খৃষ্টীয় ১৪শ শতকের প্রথমার্ধে আবির্ভূত হইয়াছিলেন;” (২) “তাঁহার নিবাস বীৰভূম জেলার নাম্নর গ্রামে ছিল”; (৩) “কৃষ্ণকীর্তনের ভাষাই আমরা চণ্ডীদাসের খাঁটি ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।”

কাল, ও দেশ, ও কবি নির্দেশ করিয়া এত পূর্ণাঙ্গ পুথী অত্যাশি প্রকাশিত হয় নাই।

২। বাদালা ভাষার খুঁটি খোজার বাতিকে পড়িয়া আমি “কৃষ্ণকীর্তন” দেখিয়াছি। বাতিকের দোষ বহু। একটা দোষ, নিঃসঙ্গ থাকিতে দেয় না। মনে করিয়াছিলাম, বঙ্গীয় অধিবর্গ এই অ-পূর্ণ গ্রন্থের আলোচনা করিবেন। কারণ, আধুনিক প্রত্যক্ষবাদের দিনে প্রাপ্ত-প্রমাণ বড় কেহ মানিতে চায় না। প্রাজ্ঞে বলেন, পৃথিবী স্থিরা নহে, বঁ-বঁ শব্দে লাটিকের মতন ঘুরিতেছে। অজ্ঞের চিরাগত সংস্কারে অভিঘাত হয়; সে সর্বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে, কই—যোরা ত ঘুরিতে পারিতেছি না। আমারও দশ। এই অজ্ঞের তুল্য হইয়াছে, আমি সংশয়ে পড়িয়াছি। সংস্কারক মহাশয় কি মুক্তি দেখাইয়া প্রাপ্ত পুথীর ভাষা নাম্নরের কবির বলেন, তাহা ঘুরিতে পারিতেছি না। আমি নিম্নলিখিত প্রশ্নবর্গের স্পষ্ট উত্তর চাই,—

(১) প্রাপ্ত পুথীর বয়স, ও দেশ।

(২) মূল পুথীর কবি ও দেশ ও কাল।

প্রাপ্ত পুথী হইতে এই দুই প্রশ্নের কি উত্তর পাওয়া যায়, তাহা সংস্কারক মহাশয় স্পষ্ট ভাবে বলেন নাই। “সম্পাদকীয় বক্তব্য” ৩৭ পৃষ্ঠা ভরিয়াছে, কিন্তু তাহার অকিঞ্চিৎ

এই-বাহ। অগত্যা আমাদের আমার সংশয় জানাইতে হইল।* অবসর ও যোগ্যতার
•অভাবে তাহা উত্তম যুক্তি দ্বারা দেখাইতে পারিলাম না।

দুঃখ হইতেছে, এষ্ট বিচার, সংস্কারক ও তাঁহার সহায়বর্গের প্রীতিকর কবিতা পারিলাম
না। তাঁহাদিগের মতি গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, যুক্তি ও ভ্রার পীড়িত করিয়াছে।
বালালা ভাষার লেখা ও ছাপা এতদেব মান-মর্যাদা কিছুমাত্র ধরু দেখিতে পারি না।

(১) প্রাপ্ত পুথীর বয়স-ও দেশ-বিচারে বাহ-প্রমাণ

৩। সংস্কারক পুথী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “ড-ভাঁজ-করা তুলোট [তুলাট] কাগজের
উভয় পৃষ্ঠা লেখা, মধ্যস্থলে ছিদ্র।” তিনি আট শতাব্দীর অধিক পুথী দেখিয়াছেন। বোধ হয়,
তিনি প্রাপ্ত পুথীর কাগজ ও কাগী দেখিয়া বয়স অনুমান করিতে পারিতেন। তাঁহাকে নির্দয়
বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, তিনি পুথীর অবস্থা ওপ্ত বাখিয়াছেন। কাগজ কীটপীড়িত ও জীর্ণ
কি না, শাদা তুলা জমাইয়া কাগজ, কি হরিতালাদি-শিশু কাগজ, কাগী মলিন, না উজ্জল;
পুথীর পাটা কাঠের, না কাগজের, ইত্যাদি বার্তা জানিতে ইচ্ছা হইতেছে। কারণ, তুলাট
কাগজ মোহমুগ্ধায় বস্কিত হইলেও পাঁচ-ছয় শত বৎসর টেকে কি? কদাচিৎ টিকিতে
পারে; কিন্তু প্রাপ্ত পুথী কদাচিৎকের পর্যায়ে পড়ে কি? কে জানে। সংস্কারকের
প্রতিজ্ঞা স্বরণ করুন, “কৃষ্ণকীর্তনের ভাষাই চণ্ডীদাসের খাঁটি ভাষা।” একখানা পুথী,
সাড়ে পাঁচ শত বৎসরের বলিতে যাইতেছেন, অথচ তিনি তাহাব অবস্থা সম্বন্ধে নির্দয়।
যদি প্রাপ্ত পুথী আধুনিক হয়, তাহা হইলে ভাষা খাঁটি আছে কি? রাখাল-বাবুর কলমে
একটা কথা হঠাৎ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। “কৃষ্ণকীর্তনের যে পুথী আবিষ্কৃত হইয়াছে,
তাহার প্রাচীন পত্র-গুলিতে।” ইহা হঠতে বুঝিতেছি, পুথীর সমুদয় পত্র এক সময়ের নহে,
বোধ হয়, এক উপাদানেরও নহে। সংস্কারক মহাশয় “পাঠ-বিবৃতি” নাম দিয়া পুথীর লেখার
কাটা-কুটির সাড়ে ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী তালিকা দিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝিতেছি, লেখার অন্তর্ভুক্ত
ছিল, লিপিকর যথোচিত সাবধানে পুথী লেখেন নাই কিংবা লিখিতে পারেন নাই। অথচ
“ভাষা খাঁটি” আছে?

৪। সংস্কারক লিখিয়াছেন, “পুথির সহিত প্রাপ্ত এক খণ্ড কাগজের লেখা [?]”
দেখিয়া অনুমান হইয়াছিল, কীর্তনের এষ্ট অপূর্ণ গ্রন্থ ২৫০ বৎসর পূর্বে বিষ্ণুপুররাজের
পুথিশালায় সম্বন্ধে রক্ষিত হইত।” ইহা হঠতে বুঝিতেছি, প্রাপ্ত পুথীর বয়স অন্ততঃ আড়াই
শত বৎসর। তিন শত বৎসর হটিয়া না গেলে মূল পুথী পাই না। কিন্তু এই দীর্ঘকালে

* এই প্রবন্ধ গত পূর্বা অবকাশে লেখা হইয়াছিল। অবসর-অভাবে দ্বিতীয় বার আলোচনা করিতে পারি
না। একটা তথ্য জানিতেও বিলম্ব হইয়াছে। মাসিক হইল, শ্রী সতীশচন্দ্র-রায় মহাশয় পরিষৎ-পত্রিকার
“শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে”র এক চমৎকার সমালোচনা লিখিয়াছেন। দেখিলাম, আমার সংশয় তিনি আর উপেক্ষা করিয়া
লিখিয়াছেন। পুথীর কাল ও ভাষার তিনিও আমি বিম্বিত চলিয়াছি। প্রবন্ধ-দেবে তাঁহার যুক্তি বিচার করিব।

প্ৰবেশে আঁলোক পাইতেছি না, কেবল অন্ধকাৰ। সে অন্ধকাৰে কি ঘটয়াছিল, কি না ঘটয়াছিল, তাহা প্ৰাপ্ত পুথী হইতে জানিতে পারিতেছি না, অত্ৰ পুথী হইতেও পারিতেছি না। আমাৰ সংশয় অহেতুক কি ?

৫। সংস্কারক লিখিয়াছেন, পুথীৰ দুই দ্ৰবৰ্ত্তী “পৃষ্ঠাৰ উপৰে পাৰ্শ্বীয় মত কি লিখিত আছে।” উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় স্থানেৰ “পৃষ্ঠাব বাম পাৰ্শ্বে তিন পঙ্ক্তি কাইতি অক্ষৰ, সম্ভবতঃ কাহাৰও নাম হইবে।” বোধ হয়, বসন্ত-বাৰু এই দুই লেখাৰ গুৰুত্বও অস্বত্ব কৰেন নাই। কৰিলে কাহাৰ অধ্যবসায়ে তিনি পুথী লইয়া কাইখী লেখাব দেশে যাঠন্তেন, ফাৰ্চী-পড়া মুনীও ধৰিতে পারিতেন। বৃত্তিতেছি, পুথীখানা কাইখী লেখাৰ দেশ দেখিয়া বিষ্ণুপুৰে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু কেবল দেখিয়া আসিয়াছিল, না সে দেশের আচাৰ-ব্যবহাৰও নিখিয়া আসিয়াছিল? প্ৰাপ্ত পুথীৰ খাটিও সম্বন্ধে সংশয় বনোভূত হইতেছে। পুথীখানা থাকিতে থাকিতে তাহাৰ বাহ লক্ষণ প্ৰকাশ কৰ্ত্তব্য। কাৰণ, যে দিনকাল পড়িতেছে, ভবিষ্য পাঠক বৰ্ত্তমান কাহাকেও অভাস্ত বলিয়া গ্ৰহণ কৰিবে না। পুথী ষত অ-পূৰ্ণ, তাহাৰ তত ভীক্ৰ সমালোচনা ও বিচাৰ চাই।

৬। জানিতেছি, এক রাশি পুথীৰ মধ্যে “কৃষ্ণকীর্তনে”ৰ পুথী ছিল। বসন্ত বাবুৰ কুতূহল দৃষ্টি সে সব পুথী নিশ্চয়ই এড়ায় নাই। কিন্তু সে সব কি পুথী, কবেকাৰ পুথী, কিংবা কোথাকাৰ পুথী, এই আবশ্যক প্ৰমাণ, প্ৰাপ্ত পুথীৰ আকৰ-বৰ্ণনাৰ, তিনি উদাসীন হইয়াছেন।

৭। সংস্কারক লিখিয়াছেন, “পুথিতে দুই হাতেৰ লেখা বেশ স্পষ্ট। * তৃতীয় হাতেৰ লেখা প্ৰথম হাতেৰ এতটা অসুকৰণ যে, বিশেষ ভাবে পৰীক্ষা ব্যতীত ধৰা পড়ে না। অবশিষ্ট ঈৰ্ষাং পুথিৰ অধিকাংশ প্ৰথম হাতেৰ লেখা।” প্ৰদ্র-লিপি-বিং লিখিয়াছেন, “এক অথবা একাধিক ব্যক্তিৰ তিন প্ৰকাৰেৰ হস্তাক্ষৰ” আছে। (১) “প্ৰাচীন হস্তাক্ষৰ”, (২) “প্ৰাচীন হস্তাক্ষৰেৰ অস্থলিপি”, (৩) “অপেক্ষাকৃত আধুনিক হস্তাক্ষৰ”।

প্ৰাপ্ত পুথী বাস্তবিক অ-পূৰ্ণ। ইহাৰ লিপিকৰ এক, কিংবা একাধিক। একাধিক হইলে দুই কিংবা তিন। তিন হইলে, দুই স্বতন্ত্ৰ, এক পরতন্ত্ৰ। তিনেৰ এক লিপিকৰ এমন পরতন্ত্ৰ যে, “বিশেষ ভাবে পৰীক্ষা ব্যতীত” তাহাৰ পৃথক্ অস্তিত্ব অস্বত্ব হয় না। পরমাশ্চৰ্য এই, সাত্বে-পাঁচ-শত বৎসরেৰ পুৰাতন পুথীৰ কিয়দংশে প্ৰাচীন, কিয়দংশে আধুনিক হস্তাক্ষৰ আছে। এই বৃত্তান্ত শুনিতে ধীৰ-ব্যক্তিৰও মন ব্যাকুলিত হইবে। কাৰণ, এতগুলি আশ্চৰ্য্য বিষয়েৰ একত্ৰাবস্থিতি দৃষ্টি-গোচৰ হয় না। সংস্কারক ও লিপিবিং, তাহাৰাও ব্যাকুল হইয়া থাকিবেন। সংস্কারক প্ৰাপ্ত লেখা পুথীৰ কোন্ পাতা হইতে কোন্ পাতা তিন হাতেৰ মধ্যে কোন্ হাতেৰ, তাহা জানাইয়াছেন; কিন্তু ছাপা বহি, ছোট পাঠক দেখিতে পাইবেন, সে বহিৰ কোন্ পাতায়, কোন্ হাতেৰ আৰম্ভ, কোন্ হাতেৰ শেষ, সেটা জানাইতে তুলিয়া গিয়াছেন। আমাৰ বিশ্বাস, লিখিকৰ হাতাৰ সাবধান হউম, অধিক

লিখিতে গেলে নিজের অভ্যস্ত বানান, এমন কি, শব্দ-বিত্তি আসিয়া পড়ে। ইহা দেখিয়া জ্ঞান কাল ও লিপিকরের দেশও ধরা পড়িতে পারে।

৮। প্রত্ন-লিপি-বিৎ পাঠককে কঠিন পরীক্ষায় ফেলিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, পৃথিবী তিন প্রকার হস্তাক্ষর এক লিপিকরেরও হইতে পারে। তিনি বলেন, আদালতে জাল দলীল আসে। গানের পুথি, বেদ নয়, চণ্ডীও নয়, গানের পুথি; তাহাতে হস্তাক্ষরের অল্পকরণ আছে! পুথিখানা অ-পূর্বই বটে। আরও আশ্চর্যের কথা, এক সময়ের এক দেশের তিন জনের হাতের অক্ষর, প্রাচীন ও অর্ধপ্রাচীন, দুই আকারের হইতে পারে। প্রত্যেকে সংশয় নাই। সংশয় সেখানে, যেখানে প্রত্নলিপিবিৎ বৎসর গণিয়া “স্থির-সিদ্ধান্ত” করিয়াছেন যে, “কৃষ্ণকীর্তনে”র আবিষ্কৃত পুথি “১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে, সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লিখিত হইয়াছিল।” সংক্ষেপে তাঁহা বলা যুক্তি এই। ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত তিনখানি গ্রন্থেব অক্ষর অপেক্ষা “কৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীন অক্ষর-সমূহ প্রাচীনতর।” ‘প্রাচীনতর’ বিবেচনাব হেতু কি, তাহা স্পষ্ট বুঝিলাম না। বোধ হয় হেতু এই, “কৃষ্ণকীর্তনে যে সমস্ত প্রাচীন আকারের অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার তিন-চতুর্থাংশেব অধিক অক্ষর পূর্বোক্ত গ্রন্থত্রয়ে ব্যবহৃত হয় নাই।”

যুক্তিটা তলাইয়া বুঝিতে হইবে। জ্ঞাত কি কি? (১) পৃথিতে প্রাচীন ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক হস্তাক্ষর আছে; (২) এক জনের অননুসৃত অক্ষর আছে; (৩) ইহাব প্রাচীন অক্ষরসমূহ [মনে করি যেন] ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বের, অর্থাৎ পরে আর ছিল না। এই তিন জ্ঞাত হেতু হইতে, “স্থিৰ” দুবে থাক, “অ-স্থিৰ” সিদ্ধান্তও করিতে পারিতেছি না যে, আবিষ্কৃত পুথি, ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে লিখিত হইয়াছিল। হয় ত আবও হেতু আছে, যাহা প্রত্ন-লিপিবিৎ লেখেন নাই। সে যাহা হউক, (১) প্রাচীন-অর্থ কি বুঝি, জানি না। (২) নবীনের সহিত প্রাচীনের সমাবেশ আছে, অথচ নবীনকে ছাড়িয়া কেন প্রাচীনকেই ধরিতে হইবে, তাহাও বুঝি না। (৩) তিনখানি প্রমাণ-গ্রন্থের কাল জানিতেছি, কিন্তু তিন প্রমাণ গ্রন্থের লিপিকরের দেশ, শিক্ষা, সংসর্গ জানি না। “কৃষ্ণকীর্তনে”র লিপিকরের সহিত তুলনা করিতে পারিতেছি না।

আমি প্রত্ন নামেই ডবাই, প্রত্ন-তত্ত্বের ত কথাই নাই। কারণ, প্রত্নতাত্ত্বিকেরা জ্ঞাত ও অজ্ঞাত তথ্য এমন মিশাইয়া দেন যে, দিশা-হার হইয়া পড়ি। প্রত্নলিপি-বিৎ রাখাল বাবুর বিচারে সে দোষ নাই, বরং অনাবশ্যক বন্ধন আছে। তিনি লিখিয়াছেন, “কৃষ্ণকীর্তনে”র যে পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার প্রাচীন পত্রগুলিতে যে বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের আকার আধুনিক। যে কয়েক স্থলে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের আকার প্রাচীন, তাহা বিচার করিলে গ্রন্থের লিপিকাল নির্ণীত হইতে পারে।” এই প্রতিজ্ঞা আমার নিকট হৃদয়ের বোধ হইতেছে। কারণ, (১) তাহার ‘প্রাচীন’ বিশেষণের অর্থ ‘পূর্বকালে ছিল, পরে ছিল না।’ এই অর্থ না ধরিলে তাহার যুক্তি ব্যর্থ

হয়। এইটুকু বুঝিলাম। কিন্তু বুঝি না, প্রাচীনের মধ্যে নবীনের বা “অপেক্ষাকৃত আধুনিকে”র প্রবেশ। বুঝি, নবীন কৃতির মধ্যে পুরাতন থাকিতে পারে, কিন্তু বিপরীত অবস্থা কল্পনাতেও আসিতেছে না। (২) পৃথিবী “কয়েক স্থলে স্বব ও ব্যঞ্জনবর্ণের আকার প্রাচীন।” বুঝি না, এই কয়েক স্থলের প্রাচীনত্বের কাল নির্ণয় দ্বারা কেমন করিয়া সব লেখা, পৃথিবীখানাই, প্রাচীন বলি। (৩) বুঝিতেছি, পৃথিবীর কতক পাতা পুরাতন, কতক নতুন। যদিও এ কথা না পৃথিবী আবিষ্কারক, না লিপিবিচারক, দুই জনের একজনও স্পষ্ট লেখেন নাই। সে যাহা হউক, পুরাতন পাতায় পুরাতন, নতুন পাতায় নতুন অক্ষর দেখিলে সংশয় লঘু হইত। কিন্তু লিপি-বিচারক বলিয়াছেন, “প্রাচীন পত্রগুলিতে যে বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের আকার আধুনিক।” এই ব্যতিক্রমে সংশয় ঘনীভূত হইয়াছে। (৪) পৃথিবী অক্ষরের ছাঁদ দেখিয়া বুঝি, লিপিকর লিপিকলার দক্ষ ছিল; আর ত লিপি করা তাহার ব্যবসায় ছিল। তিন লিপিকরের মধ্যে এক জনের অক্ষরকরণ-বুদ্ধিও ধরা পড়িয়াছে। কে জানে, অত্র দুই লিপিকর নবীন হইয়াও প্রাচীন রীতি রক্ষা করে নাই। (৫) প্রত্নলিপিবিশেষ মাত্র তিনখানি গ্রন্থের অক্ষরের সহিত বিচার পৃথিবীর তুলনা করিয়াছেন। পরে লিখিয়াছেন, “‘কৃষ্ণকীর্তনে’র প্রাচীন অক্ষরের তিন-চতুর্থাংশের অধিক প্রমাণ-গ্রন্থে ব্যবহৃত হয় নাই।” না হউক, জিজ্ঞাস্য, এই “হয় নাই” হইতে “হইয়াছে” সিদ্ধ হইতে পারে কি?

২। রাখাল বাবু ক্ষমা করিবেন, তাঁহার যুক্তি জাল আমার বুদ্ধির অভ্যন্তর হইয়াছে। তাঁহার কৃত সংজ্ঞা ‘প্রত্ন-লিপি-তত্ত্ব’ আমার বুদ্ধিকে অভিভূত করিয়াছে। কারণ, বর্ণন-শাস্ত্রের সার, ‘তত্ত্ব’। প্রত্ন-লিপি-বৃত্তান্ত বিজ্ঞান-পদবীতেও পড়ে না, যদিও ইংবেজী palaeography শব্দে প্রত্ন-লিপি-বিজ্ঞান, এইরূপ বলা হইয়া থাকে। বিজ্ঞানে জানা হইতে অজানার বাইতে পারা যায়, ইতিহাস ও বৃত্তান্তে জানা ছাড়িয়া এক পদ অগ্রসরের পথ নাই। রাখাল বাবু যে সকল যুক্তি দিয়াছেন, সে সকল ইতিহাসের কথা। যথা, অমুক সময়ে অমুক দেশে অমুক অক্ষর প্রচলিত ছিল। যদিও তিনি এরূপ প্রমাণও দিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রদত্ত প্রমাণ, অমুক সময়ে, অমুক স্থানে, অমুক শিলায়, অমুক তাম্রশাসনে, কিংবা অমুক পৃথিবীতে, এইরূপ অক্ষর আছে। এইরূপ প্রমাণে কত বাধা পড়িল, তাহা বলিতে হইবে না। বস্তুতঃ তাঁহার উপজীব্য অতি-অল্প। একে, অল্প দ্বারা ব্যাপ্য-ব্যাপক-জ্ঞান নিঃসংশয় হয় না, জ্ঞান উপর অর্থের উপজীব্যও অল্প। ভূ-তত্ত্বের দ্বারা অক্ষরের আকারের পূর্ণাঙ্গের স্তর পাওয়া যায় কি না, জানি না। কিন্তু বলিতে পারি, বহু কাল গত না হইলে, কিংবা লিপ্যব নী বটিলে আকার-পরিবর্তন লক্ষ্য হইবে না। কারণ, লেখা কৃত্রিম অক্ষরকরণ; একটা কলা—বাহার উৎপত্তি অজ্ঞাত, আদর্শ অজ্ঞেয়, পরিণাম মানব-মনের ও মানব-কর্মে-কেন্দ্রের হর্ডেই রহিতে প্রচ্ছন্ন। মূলতঃ লিপি-কলা একটা কৃত্রিম কলা। ইহার পরিণামকর্ম আবিষ্কৃত হইতে পারে, কিন্তু তাহা দ্বারা বৎসর গণিতে পারা যাইবে না।

হই একটা সামান্ত দৃষ্টান্ত লই। ওড়িয়ায় সহস্র সহস্র মন্দির দেখিতে পাই, সব এক সময়ে নিশ্চিন্ত হয় নাই, অথচ নির্মাণ-বীতি এক। “কৃষ্ণকীর্তনে”র ত্রিবিধ হস্তাক্ষরের অল্পরূপ দৃষ্টান্তও আছে। ওড়িয়ায় এই ছাপার অক্ষরবেদ দিনেও হাতেব ত্রিবিধ অক্ষর চলিত আছে। (১) বামুনী অক্ষর, (২) কবণী অক্ষর, (৩) সাধাবণ অক্ষর। বর্ণমালার সমুদায় তিন অক্ষরে প্রকাশ্য নাই, কয়েকটা আছে। কত কাল হইতে আছে, কে জানে। তিনের কোনটা প্রাচীন, তাহাও নির্ণীত হইতে পারে। কিন্তু যিনি ত্রিবিধ লিপি না জানেন, তিনি তিনটা কাল অসম্ভব কবিতা বসিবেন। আরও উল্লেখ, ওড়িয়ায় সামন্ত-রাজ্যে, অন্ততঃ একটায়, এমন কয়েকটা অক্ষর চলিত আছে, যাহা উক্ত তিনের বাহ্য। উহাকে ক্ষত্রীয়া অক্ষর বলিতে পারি। অল্প-পরিষদ দেশে একদা চারি প্রকার অক্ষর চলিতেছে। বর্ণমালার সব অক্ষর নয়, কয়েকটা মাত্র। কিন্তু এই কয়েকটা এমন যে, অনতিক্রম পদ্ধিতে পারিবে না।

১০। প্রত্নলিপিসিং উল্লিখিত সংশয়ের উত্তর দেন নাই। সুতরাং সম্প্রতি তাঁহার সাক্ষ্য বিশ্বাস হইল না। পৃথিবী আবিষ্কারক বসন্ত বাবু “আট শতের অধিক পুষ্টি” দেখিয়াছেন। “কৃষ্ণকীর্তনে” পৃথিবীর সহিত এক খণ্ড কাগজের লেগা দেখিয়া [তাঁহার] অসম্ভব হইয়াছিল, “কীর্তনের এই অপূর্ণ গ্রন্থ ২৫০ বৎসর পূর্বে বিষ্ণুপুর-রাজ্যের পুথিশালায় সঞ্চে বন্ধিত হইত।” তিনি অল্পত্ন লিখিয়াছেন, “এ পর্যন্ত যে প্রাচীন গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার আদর্শ বড় জোর ২৫০ বৎসরের; ৩০০ বর্ষের আদর্শ দেখিয়া মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা নিতান্ত কম।” ইহা হইতে বুঝিতেছি, বাঙ্গালা পৃথিবীর পবনায় ৩০০ বৎসরের অধিক নয়। “কৃষ্ণকীর্তনে”র পৃথিবীর এমন কি ভাগ্য ছিল যে, ইহার পরমাণু আড়াই শত বৎসর ব্যক্তিরা বাইবে। সে ভাগ্য কি, তাহা সংস্কারক গণিয়া বলেন নাই। কি ঘটিয়াছে, তাহাও যেন বুঝিতেছি। কামনা জুটিয়া মুক্তির পথ বোধ করিয়াছে। চ-ভী-দা-স, এই নাম “পৃথিবীর চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে” টানিয়া লইয়া গিয়াছে। এই কাল, “চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে” অভিযুক্ত করিয়াছে। উক্ত কালের পূর্বে বাইবার বাধা ছিল। কারণ, তখন চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে গুণ-গোল ঘটিত।

পৃথিবীখানি এখনও বর্তমান। আশা করি, সংস্কারক মহাশয় নিঃসংশয় হইয়া সংসার ভঞ্জন করিবেন। থাক না বড় চতুর্দশ শতাব্দীর ভণিতা, বাঙ্গালীদেবীর নাম। ব্যাসের নামে বহু পুরাণ আছে, মহাভারত নামে ইতিহাসও আছে। কিন্তু সকলেই কি ব্যাসের “বাঁটা ভাঙা” আছে? যদি বা আছে, কতটুকু আছে, কে জানে। মূর্তি ও প্রতিমূর্তি এক নয়; অল্পমূর্তি কদাপি নয়।

(২) প্রাপ্ত পৃথিবীর বয়স-ও দেশ-বিচারে আভ্যন্তর প্রমাণ

(ক) শব্দের বানান বিচার

১১। প্রাপ্ত পৃথিবীর বর্ণাঙ্কিত এত যে, তাহাতে পাঠকের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। এক-অর্থ-ব্যঞ্জক ধ্বনিব আক্ষরিক পিত্ত বিভিন্ন হইলে বর্ণাঙ্কিত বলি। এক এক অক্ষর

এক এক ধ্বনির স্রোতক। ধ্বনি-অমুখ্যায়ী স্রোতক বসাইয়া গেলে ধ্বনি-সংবাদী বানান হয়। এই বানান সম্পূর্ণ শুদ্ধ। কারণ, ধ্বনি তাহাব প্রমাণ। যেখানে ধ্বনি প্রমাণ না হইলেও স্রোতি, পরস্পর্য্য, বা বিধি প্রমাণ হয়, সেখানে বানান ধ্বনিসংবাদীও তুচ্ছ শুদ্ধ না হইলেও সঙ্কেত-সংবাদে শুদ্ধ। আমবা বলি হো-বি, কিন্তু লিখি হ-রি। হো-রি ধ্বনি-সংবাদী, হ-রি সঙ্কেত-সংবাদী বানান। হ-বি, এই সঙ্কেত একবার গ্রহণ করিয়া, উহার পরিবর্তন করিলে সঙ্কেত অশুদ্ধ হয়, বানান অশুদ্ধ হয়। হ-রি বানান নিয়ম-বিধি। অপূৰ্ণ-বিধি ভলে যেমন দোষ, নিয়ম-বিধি-ভঙ্গেও তেমন দোষ।

আমি জানি, পৃথিবী বানান অশুদ্ধ, এই কথা বলিলে কেহ কেহ ক্ষুব্ধ ও কষ্ট হন। তাঁহাদিগেব তৃপ্তার্থে উপবে একটু ভূমিকা করিতে হইল। ইহাতেও তাঁহারা তুষ্ট হইবেন কি না, সন্দেহ। কারণ, তাঁহারা বিবেচনা করেন, বানানে নিয়মভঙ্গতা সে কালে নিয়ম ছিল। এমন পৃথিবীওয়া যায় নাই, যাহাব বানান আগা-গোড়া ‘শুদ্ধ’। এই উক্তি সত্য কি না, জানি না। সত্য হইলে বুঝিব, লিপিকর হাতেব ছাঁদ অভ্যাস করিত, বানান লিখিত না। কারণ, নিয়মভঙ্গিতা মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। অক্ষরের ছাঁদ ভাল; অথচ সমাবেশ ভাল, যে লিপিকরের চোখে না পড়ে, সে বুদ্ধিতে হীন। তাহাকে বানানের বিচারক জান করিতে পারি না। ইহা অগণ্য। সে ভাল, যে কাঁচা হাও পাকাইয়াছে, কিন্তু ধ্বনিতে কিংবা সঙ্কেতে ভাল বানান বৃহৎ পৃথিবীর সর্ব্বত্র এক রাখিতে পাবিয়াছে। তাহাব বানান, প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইলেও হইতে পারে।

১২। হৃৎধ্বের বিষয়, “কৃষ্ণকীর্তনে”র লিপিকর কাঁচা। তাহাব বানান ক্রমচ্ছিন্ন; একই অর্থে একই শব্দের বানান এক নহে। যেমন শ্রবণার্থ শু-ন ধাতু, শু-ণ, শু-ন, সু-ণ রূপ পাইয়াছে। ইহা হইতে শু-ণি-আ, শু-ণী-আ, সু-ণি-আ, সু-ণি-আ, সু-ণি-য়া, শু-ণী, সু-ণী। কেবল বাঙ্গালা শব্দের বানানে এইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা, এমন নহে। সংস্কৃত শব্দের দশাও এইরূপ। যেমন, শু-ণ, শু-ন, শু-ণ-নি-দী; গি-রি, গি-রী; গ-তি, গ-তী; হ-রি, হ-রী; আ-শ, আ-স; আ-কা-শ, আ-কা-স ইত্যাদি। অস্থানে আ, এত আছে যে, সে বিষয়ে পরে লিখিব। লিপিকর অ-শিক্ষিত। কিংবা তাহার হাত ভাল, বুদ্ধি কাঁচা।

১৩। সংস্কারকের নিকট এই বানান-বিভীষিকা সহজবোধ্য হইয়াছে। তিনি লিখিত-ছেন, “কৃষ্ণকীর্তনে” প্রাকৃত এবং তজ্জাত শব্দসংখ্যাই অধিক; সংস্কৃত শব্দের ভাগ অতি অল্প। সেই হেতু বর্ণ-বিজ্ঞাস-প্রণালী কিছু বিচিত্র।” যুক্তিটা নূতন বটে। তাঁহার বিবেচনার “প্রাকৃত” শব্দের বানানে নিয়ম ছিল না। কিন্তু “সংস্কৃত” শব্দবানানেও কি অনিয়ম ছিল? তাঁহার উক্তি প্রমাণ-সাপেক্ষ। আর, বিচার্য্য বস্তুকে প্রমাণ ধরিতে পারা যায় না।

অধির বোধ হইয়াছে, সংস্কারক মহাশয় প্রথমে কামনার বস্তুতা স্বীকার করার পরে ব্যাখ্যার উল্লেখ হইয়াছেন। তিনি কামনা কবিয়াছেন, প্রাপ্ত পৃথিবীনি বড় চণ্ডীদালয়। ইহাতে চণ্ডীদালয়ের “খাঁটি ভাবা” আছে। কবি মুখ ছিলেন না, পরন্তু সংস্কৃত ভাবার পণ্ডিত

ছিলেন। নতুবা সংস্কৃত শ্লোক রচিতে পারিতেন না। অতএব আমাদের চোখে যে বানান ভুল বোধ হইতেছে, তাহা বস্তুতঃ অশুদ্ধ নহে। যথা, এই পুণীতে ন ও শ স্থানে যে শ ও স আছে, তাহা শৌৰসেনী “প্রাকৃত”ের প্রভাব। সে “প্রাকৃত”ে ণ-কার ও স-কার উচ্চারিত হইত। কিন্তু সংস্কৃত এই, সর্বত্র সে প্রভাব থাকিল না কেন? ইহা উত্তর, শ বানান, মাগধী “প্রাকৃত”ের প্রভাব, ন বানান পৈশাচী “প্রাকৃত”ের প্রভাব। এইরূপ, হ-রি স্থানে যে হ-রী বানান আছে, তাহা মহাভারত “প্রাকৃত”ের প্রভাব, ইত্যাদি। এইরূপ ব্যাখ্যা, জানি না কেন, এত পণ্ডিতকে প্রলুব্ধ কবে। বোধ হয়, শাস্ত্র-প্রবৃত্তি দ্বারা তর্ক-বিজ্ঞা পবাক্ষিত হয়। যেহেতু শাস্ত্রে লিখিত আছে, অতএব ইহা সে-ই,—এই যে যুক্তি-হীন বিচার, তাহা শাস্ত্র-প্রবৃত্তির লক্ষণ। শাস্ত্র-প্রবৃত্তির একটা গুণ আছে, অলম্ব্যাসে চিন্তেব প্রসাদ অয়ে। ইহাতে কিন্তু অধেষণা পবাস্ত হয়, সত্য-মিথ্যাব প্রভেদ প্রচ্ছন্ন হয়। “কৃষ্ণকীর্তনে”ব সংস্কারক নানা প্রবন্ধে বলিতে চান, যেহেতু এই গ্রন্থে “প্রাকৃত” ও “তজ্জাত” শব্দের সংখ্যা অধিক, সেহেতু ইহা বহু প্রাচীন। সম্প্রতি ইহাতেও আমাব আপত্তি নাই। কিন্তু যখন দেখি, “কৃষ্ণকীর্তনে”র ভাবায়, ব্যাকরণে ও শব্দের ব্যাপ্তি নির্দেশে সেই “প্রাকৃত”ের ধুআ, তখন তাহাঁর “প্রাকৃত” সংজ্ঞাব লক্ষণ পাইতে চাই। অনুমানের অবয়ব-নয় তঁাহার কামনা প্রকাশ করি। (১) “প্রাকৃত” শব্দ পূর্বকালে প্রচলিত ছিল (পবকালে ছিল না?); (২) এই পুণীতে “প্রাকৃত” শব্দ আছে; (৩) অতএব এই পুণী পূর্বকালে বচিত। কিন্তু হুংথের বিষয়, উদাহরণ ও হেতু, দুই অবয়বেই সন্দেহ। ‘পূর্বকাল’ অর্থে কোন্ কাল, তাহা বলিতে হইবে, “প্রাকৃত” শব্দ, অর্থে কোন্ শব্দ, তাহাও স্পষ্ট করিতে হইবে। সহজ বুদ্ধিতে বুঝি, “কৃষ্ণকীর্তনে”ব বানান অশুদ্ধ। ইহা হইতে প্রাপ্ত পুণীৰ দেশ কিংবা কাল কিছুই জানা গেল না।

(খ) শব্দ-বিচাব

১৪। পুণীর বানান দেখিয়া শব্দ বুঝিতে হয়। বানানে ভুল থাকিলে এবং অর্থ ধরিতে না পারিলে শব্দটি বুঝিতে পারা যায় না। যদি “কৃষ্ণকীর্তন” লিখিবার সময় ণ, ন, শ স, ই ঈ, আঁ এঁ, ইত্যাদির ধ্বনিতে ভেদ থাকিত, তাহা হইলে একই শব্দের কোথাও এটা, কোথাও ওটা লেখা দেখিতাম না। কিন্তু আ স্থানে আ লেখাতে ধ্বনিভেদ স্বীকার করিতে হইতেছে। সংস্কৃতে অকাবের দীর্ঘ আ-কার। বাঙ্গালাতে অর্কার আকার দুই ভিন্ন স্বর। পূর্বকালে এক ছিঁ কি? তিন শত বৎসরের পুণীতে এক নয়। “শূত্রপুরাণে”, “বৌদ্ধশাসন ও দোহা”তে নয়। “সর্বানন্দো”* শব্দও বোধ হয়, এক নয়। অথচ “কৃষ্ণকীর্তনে” অ-কারণ আ-কার, অ-প-মা-ন আ-প-মা ন, অ-ধি-ক আ-ধি-ক, ইত্যাদি বিবিধ বানান পাইতেছি। আমার বোধ হয়, আ স্থানে আ বানান লিপিকরের ভ্রম নয়। ভ্রম হইলে আ অল্প পাইতাম।

* “শাট শত বৎসরের পুরাণা বাঙ্গালী ধর্ম”,—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, এই বৎসরের দ্বিতীয় সংখ্যা।

আ কাটিয়া অ লেখাও দেখিতাম। একটা কারণ কল্পনা করি। মূল পুথী অন্ততঃ দুই দেশে দেখিবার পর অনুলিপি করা হইয়াছে। সে অনুলিপি বর্তমান পুথী। এক দেশে অ ছিঙ্ক, অন্য দেশে কতকগুলি অ পরিবর্তিত হইয়া আ হইয়াছিল। বর্তমান পুথীর লিপিকরও অ স্থানে আ করিয়া থাকিতে পারে। ফলে একই দাঁড়াইতেছে। এই দেশ ভ্রমণ স্বীকার না করিলে অ-ধি-ক আ-ধি-ক একার্থে লিখিত হইতে পারিত না। অত কথায় কাজ কি, কবির নিজের নামের বানান কোথাও অ-ন-স্ত, কোথাও আ-ন-স্ত হইতে পারিত না। এক দেশে তিনি ছিলেন অ-ন-স্ত; দেশান্তরে হইয়াছিলেন আ-ন-স্ত। দৃষ্টান্ত ধরুন,—বা-জা-লী, ব-জা-লী, ক-লি-কা-তা, ক-লি-ক-তা। অনন্ত কবি সংস্কৃত ভাষা জানিতেন; অথচ নিজের নাম আ-ন-স্ত বানান কবিলেন? পুথীর সংস্কারক মহাশয় অকাব-আকারেব বিবোধ এক কথায় মিটাইয়া দিয়াছেন। তিনি অ-ই-ম স্থানে আ-ই-ম পাইয়া লিখিয়াছেন, “আজ অকাবাব স্থানে ‘অ’ আদেশ বাঙ্গালা ভাষাব একতম বিশেষত্ব।” হেতুটা কাজের হয় নাই, কারণ পুরাতন পুথী হইতে বিশেষত্বের প্রমাণ দেন নাই। তা ছাড়া বাঙ্গালা ভাষায় কতক শব্দের আজ (সংস্কৃতের) অ স্থানে আ হয় বটে, কিন্তু তা বলিয়া আ-তি, আ-ধি-ক, আ-ভি-মা-ন প্রভৃতি শব্দে হয় না। তবে যদি পাণিনি-শাস্ত্র খুলিয়া অ-বর্ণের বিবৃত উচ্চারণ বলেন, তাহা হইলে কথা নাই। কেবল আজ অ স্থানে আ হয় নাই, অন্ত্য অ স্থানেও হইয়াছে। যথা, ধা-হ—ধা-হা, চা-হ—চা-হা, জা-হ—জা-হা, পা-হ—পা-হা, ইত্যাদি। আসামীভাষায় এইরূপ আছে।

১৫। “কৃষ্ণকীর্তনে”র কতকগুলি শব্দে বিশেষ আছে। যাদও পুথীর দেশ-কাল-নির্ণয়ে সব লাগিতেছে না, একত্র করিলে সন্দেহ সূচনা করিতে পারে: (১) শব্দের অন্ত্য স্বর লোপ। যথা, অ-ভ-র-সা—অ-ভ-র-স, র-স না—ব-স-ন, কাঁ-চা—কাঁ-চ, ঝ-গ-ড়া—ঝ-গ-ড়, ক্রি-ছ—কি-ছ। (২) অন্ত্য সংযুক্ত ব্যঞ্জননের একটির লোপ। যথা, অ-মূল্য—অ-মূল, অ-যো-গ্য অ-যো-গ, যো-গ্য—যো-গ, শূ-ন্ত—শূ-ন, ই-চ্ছা—ই-ছা, বু-দ্ধি—বু-ধি; সি-দ্ধি—সি-ধি। (৩) মধ্যস্থিত সংযুক্ত ব্যঞ্জননের একটির লোপ। যথা, হু-স্ত-র—হু-ত-র, হু-ল-ভ—হু-ল-ভ—হু-ল-হ, নি-ল-জ—নি-ল-জ, স-ম্মা-ন-স-মা-ন। (৪) স্ত স্থানে থ, ট স্থানে ঠ। যথা, অ-স্ত—আ-থ, ন-ষ্ট—ন-ঠ, ক-ষ্ট—ক-ঠ। (৫) ল স্থানে ন। যথা, লা-হ-ন—না-হ-ন, লে—নে। (৬) ত স্থানে ন। যথা, থ-চি-ত—থ-চি-ন, তি-থী-ত—তি-থী-ন। (৭) পুথিতে কু হু নাই, আছে ড ট, তথাপি ড স্থানে র। যথা, রাজা ব-র হু-ব-র (১২৬ পৃ:), আ-রী—আ-রী (১৫১), প-রি-লো ব-র নীরে (২২৫)—(পড়িলো)। (৮) শ স্থানে হ, হ স্থানে শ বা স। যথা, তোর না পুরিবে আ-গা (১২৭)—আ-গা, প-স-রি-ল (২৮০)—প-হ-রি-ল (প্রহারিল)। (৯) র, ল লোপ। যথা, ম-বি-লো—ম-ই-লো, মা-মি-লো—মা-ই-লো, বুলি-ল—বু-ই-ল, অ-ভি-লা-ম—অ-ভি-হা-ম। (১০) র আগম একটা শব্দে। যথা, কদমতলাত রাধা রা-হী (৩৪৮)। আ-রী স্থানে র-জী—রা-হী (অর্থ, রাধা এবং বড়ারী)।

এই অর্থে “শূদ্রপুরাণে” “লক্ষী চারি জুগেব রা-ই”। র অগম উত্তর ও পূর্ববঙ্গে অধিক। “শূদ্রপুরাণ”ও উত্তরবঙ্গ দেখিয়াছিল।) কয়েকটি শব্দে নূতনত্ব আছে। যথা, স-জ ধাতু (সজ্জীকরণে) হইতে ‘স-জা-ই-আ’। আমরা বলি সা-জা-ই-আ’। গ-ক-অ—ও-ক-আ স্থানে; চ-দা (চ-ম্প-ক), দূ-তা (দূতী), প-ত্ব ধাতু পরিধানে, প-য় ব, প-এ-র (পদের); ব-ড়ী (ব-ড়), ব-জু-লী (বাজুলী), আ-অ-ব (আ-ব), স-ক-প-সি (মৈথিলী স-ক-প-স) ইত্যাদি। শব্দের বিশেষগুলি স্মরণ করিলে মিথিলা ও আসামের মধ্যস্থান, উত্তরবঙ্গ মনে হয়। প-ত্ব ধাতু, আ-ই স্থানে বা-ই, উত্তরবঙ্গের পুথিতে দেখিয়াছি।

(গ) বিভক্তি-বিচার

১৬। শব্দের রূপ বাহাই হউক, বিভক্তির রূপ একপ্রকার না হইলে ভাষা বুঝিতে পারা যায় না। সংস্কায়ক মহাশয় লিখিয়াছেন, “প্রত্যয়-[?] লোপ ও বিভক্তিবিনিময়ের দৃষ্টান্ত অবিরল। একাধিক প্রত্যয়ের [?] একত্র প্রয়োগ সাধারণ।” সোজা বাঙ্গালীর, “কৃষ্ণ-কৌতুকে”র ভাষায় বিভক্তি একপ্রকার নাই, বহুপ্রকার আছে। এই বক্তব্য দ্বারা কি অমুমান হয়? অমুমান হয়, পুথীখানি খাঁটি নাহি, মিশাল হইয়াছে, অর্থাৎ মূল পুথী আর আবিষ্কৃত পুথী এক নহে। মূল পুথী এক সময়ে এক দেশে লেখা হইয়া থাকিবে। এখন যে পুথী পাইতেছি, সেটা খাঁটি নাহি, হয় দেশান্তরে, না হয় কালান্তরে, কিংবা দেশ-কালান্তরে পরিবর্তিত হইয়াছে।

সংস্কায়ক মহাশয় বিভক্তি-পরিবর্তনের তালিকা করিয়াছেন। এখানে কয়েকটার উল্লেখ করি। বিভক্তির উৎপত্তি-অনুসন্ধানে প্রয়োজন নাই; একই কারক ও ক্রিয়াপদে কত প্রকার বিভক্তি বসিয়াছে, তাহা দেখা প্রথম কর্তব্য। কর্তাকারকে অকারান্ত শব্দের উত্তর এক-বচনে ‘এ’। সর্বত্র এই বিধি রক্ষিত হয় নাই। দেখিতেছি, কর্তাকারকে ‘ক’, ‘কে’, ‘কৈ’, ‘রে’—এই চারি বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ, সম্বন্ধে ‘ক’, ‘ব’, ‘কের’; অধিকরণে ‘এ’, ‘ত’, ‘তে’, এক স্থানে এক সময়ে প্রচলিত ছিল কি? নিমিত্তার্থে ‘করিবাক’, ‘করিবানে’, ‘করিতে’; অনন্তরূপে ‘করি’, ‘কবিআ’। এইরূপ, ক্রিয়াবিভক্তিও এক ময়। ক-রে, ক-র-এ আছে; ক-র-ন্তি, গে-লা-ন্ত আছে, কিন্তু অপর শত স্থলে অ-ন্তি নাই। সেটা কি ভাষা, যেটার কারক ও ক্রিয়ার ঠিকানা নাই?

সংস্কায়ক মহাশয় বর্তমান ছাড়িয়া ভূত, বাস্তব ছাড়িয়া অবাস্তবের দিকে ধাবিত হইয়াছেন। সেই প্রাচীনদের কামনা, “প্রাকৃত”ভাষার প্রভাব। হুই একটা উদাহরণ দি-ই। কর্তা কারকে এ; সংস্কায়ক অর্মনই লিখিলেন, ‘এ’ “মাগধীর অমুরূপ”। সেহেতু, ‘গাইল বড়ু চণ্ডীদাস’ আছে। এ-কারের লোপও হইত। সেহেতু, ‘গাইল চণ্ডীদাস’ আছে। কিন্তু মাগধী “প্রাকৃতে” কর্তা-কারকে এ-কার হইত না, অথচ “কৃষ্ণকৌতুকে” আছে। সংস্কায়কের উত্তর, সেটা “প্রথমাব অমুরূপ”। অর্থাৎ তাহার মতে বিভক্তিহারা কর্তা কর্তা বুঝিবার

উপায় ছিল না। তাঁহার মতে “প্রত্যয়লোপ ও বিভক্তি বিনিময়” “অপভ্রংশ ভাবাব প্রভাব।” কিন্তু এ প্রকার নির্ণয় উক্তির প্রমাণ চাই।

১৭। “কৃষ্ণকীর্তনে” কয়েকটি নূতন বিভক্তি আছে। (১) ক্রিয়াবিভক্তি পরে ‘হা’, ‘হে’ বোগ। বধা, আ-ছি-লা—আছিলা-হা, হ-য়ি-লা—হয়িলা-হা, গে-লা—গেলা-হা, ক-রি-বে—করিবে-হে। এইরূপ ‘হা’ ও ‘হে’ দ্বারা বোধ হয়, শেষ স্বর দীর্ঘ করা হইত। এই ব্যাখ্যা ঠিক হইলে হ-রী, ম-তী প্রভৃতি শব্দের অন্ত্য স্বর ‘ঈ’ লিখিবাব কিছু হেতু পাওয়া যায়। শেষ স্বর দীর্ঘ করা বাঙ্গালার রীতি নহে। পূর্বকালে সে রীতি ছিল কি না, কে জানে। কিন্তু অত্ৰাপি মৈথিলী ভাষায় সে রীতি অনেকটা আছে। অনন্তবার্থে ‘ই’ (যেমন ক-রি) স্থানে ‘ঈ’ প্রত্যয় “কৃষ্ণকীর্তনে” যেমন প্রচুর, মৈথিলী ভাষাতেও যেমন। ইহার সহিত মৈথিলী ভে-না-হ, গে-ল-ছ-না-হ, ক-বৈ ত-ছ-না-হ প্রভৃতি হান্ত ক্রিয়াবিভক্তি তুলনীয়। (২) “কৃষ্ণকীর্তনে” ব ক্রিয়াপদের আব এক বিশেষ মৈথিলীতে আছে। জ্যোতিষ কর্তার ভূতকালে জ্যোতিষ ক্রিয়াপদ। বধা, ‘আগুন্তি চ-লি-লী মোর সুন্দরী নাতিনৌ’, ‘মথুরা চ-লি লী রাধা বড়ায়ির সঙ্গে’, ‘চ-লি-লী গোআলার বী দধি বিকে জাএ’, ‘চ-লী ভৈ-লী চন্দ্রাবলী’। ক্রিয়াপদেব লিপ্যভেদ বাঙ্গালায় পাই না। পূর্বকালে ছিল কি না, কে জানে। মৈথিলীতে কিন্তু আছে। (৩) “কৃষ্ণকীর্তনে” ‘ইল’-প্রত্যয়নিম্পন্ন বিশেষণ-পদ অনেক আছে। বধা, ‘দে-খি-ল পা-কি-ল বেল পাছের উপরে’ (৪৫ পৃঃ), ‘ভাঁ-গি-ল নেহা পুনী ঘোড়াইতে শকতা’ (২৬ পৃঃ), ‘কা-টি-ল ঘাঅত লেঘুবস দেহ কত’ (৩৯৮ পৃঃ)। এইরূপ বিশেষণপদ বৈষ্ণব পদাবলীতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাও শুনিয়াছি, বৈষ্ণব পদকর্তা মৈথিলী ভাষা অমুকরিতেন। কথিত বাঙ্গালাতেও ছই একটা ই-ল-যুক্ত বিশেষণ আছে। কিন্তু সাধারণ নহে। মৈথিলীতে ই-ল স্থানে অ-ল হয়, এবং অ ল প্রত্যয়ান্ত পদ সাধারণ বলিতে পাওয়া যায়। “কৃষ্ণকীর্তনে” ব ক্রিয়াপদে মৈথিলীর সাদৃশ্য আরও স্পষ্ট। বধা, ‘দেখিল কোপিল কাহাঞি র-হি-ল-ছে গাশে’ (১২০ পৃঃ), ‘বাস পাঞা র-হি-ল-ছে কেহে’ (২৬২ পৃঃ), ‘নানা ফুল ফু-টি-ল-ছে মাঝ সুন্দাবনে’ (২৪৭ পৃঃ)। মানভূমী ভাষায় গে-ল-ছে আছে; কিন্তু ইহাতেই সন্দেহ দূর হয় না। (৪) একটা নূতন বিভক্তি ই-আ-র পাইতেছি। বধা, আ-নি-আ-র (আনিহার), ক-হি-আ-র (কহিহা-র), দি-আ-র (দিহা-র)। ইহাতে বুঝিতেছি, পৃথী এমন স্থানে সিরাহিল, যে স্থানে ব উচ্চারিত হইত, এবং ব স্থানে অ উচ্চারণও ছিল। (কিংবা ই-হা স্থানে ই-আ, পরে র আগম। কহিহা-র, আনিহা-র, দিহা-র।) পৃথীতে এক স্থানে স-রো-অ-র কাটিয়া লিপিকর স-রো-ব-র করিয়াছিল। (অন্তর্যাক স-রো-ব-র কাটিয়া স-রো-অ-র ছাপাইয়াছেন।) শেষে ‘র’ অত্র ছই গদেও আছে। বধা, আ-ছে-র, গে-লি-র। (বোধ হয় ‘ক’ স্থানে ‘র’। অর্থাৎ প্রথমে ‘ক’, পরে লোপে ‘অ’, পরে ‘র’ বোগ। উত্তর-বর্ধের ‘র’ বোগ স্রবণ করাইতেছে।) বোধ হয়, ‘র’ স্থানে ‘ল’ হইয়া চলিহ-লি, দিহু-লি, করিল-লি।

১৮। সংস্কারক লিখিয়াছেন, “ক্রিয়াপদের উত্তর ‘অ’ প্রত্যয় অদ্যাপি চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত।” আমি স্বদূর চট্টগ্রামের পরিবর্তে উত্তরবঙ্গে অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক শ্রী অরেন্দ্রচন্দ্র রায়-চৌধুরী মহাশয় গত ২২শে পৌষ আমার প্রশ্নের উত্তরে লিখিয়াছেন, “আপনার জিজ্ঞাস্তা বিষয় ও তৎসম্বন্ধে আমার অভিমত লিখিত হইল। প্রথমতঃ আপনার অনুমান ও তৎপরে আমার মন্তব্য লিখিত হইল,—

আপনি লিখিয়াছেন, “এমন স্থানে কৃষ্ণকীর্তনে শেষ লেখা হইয়াছে, যে স্থানে

(১) আ-তি, আ-ধি-ক, আ-প-মা-ন প্রভৃতি বলে। অর্থাৎ বহু শব্দের আত্ম অকার অকার উচ্চারিত হয়।”

মন্তব্য। “এইরূপ ব্যবহার লৌকিক রাজবংশী ভাষায় বহু দেখা যায়।”

“(২) আসামী ভাষার কারক ও ক্রিয়াবিভক্তি চলিত ছিল।” মন্তব্য। “ইহা প্রকৃত।”

“(৩) আসিঅঁ, করিঅঁ প্রভৃতি পদ অমুনাসিক হয়। ইহা বীরভূমের লক্ষণ বটে, কিন্তু আসাম ও রঙ্গপুরের ভাষায়ও লক্ষণ। বস্তুতঃ সমস্ত উত্তরবঙ্গের ভাষায় লক্ষণ, মিথিলা-হইতে আসাম।”

“(৪) একটা বিশেষ দেখিতেছি। কৃষ্ণকীর্তনে এইরূপ পদ আছে। অমুজ্জায়, আনি-আর (আন), কহি-আর (কহ), দি-আব (দেহ)। এইরূপ, আছে-র (আছে), গেলি-র (গেল)। আমি জানিতে চাই, উত্তরবঙ্গে এইরূপ র যুক্ত ক্রিয়াপদ এখন শুনিতে পান কি না, কিংবা কোন পুরাতন বহিতে লক্ষ্য করিয়াছেন কি না।”

“মন্তব্য। উল্লিখিত তৃতীয় ও চতুর্থ প্রশ্নে লিখিত লক্ষণ ও ব্যবহার রাজবংশী ভাষায় বহু পরিদৃষ্ট হয়।”

“(৫) জৌলঙ্গ কর্তার অতীত ক্রিয়াপদ জৌলঙ্গ, কৃষ্ণকীর্তনে ইহাও পাইতেছি। ইহা মৈথিলীতে আছে। উত্তরবঙ্গেও ছিল কি? যেমন, বাধা

বসিলী মাথাত দিঅঁ হাথে।

বড়ারি চলিলী আন পথে ॥

“মন্তব্য। রাজবংশী ভাষায় এইরূপ ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়।” এই সব উত্তর পাইয়া বুঝিলাম, আমার পূর্ব অনুমান মিথ্যা নহে। “কৃষ্ণকীর্তনে”র পুথী উত্তরবঙ্গ ঘুরিয়া বিষ্ণুপুরে আসিয়াছিল। সংস্কারক মহাশয়ও প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি ঢাকাতে আসামী ভাষায় রচিত গ্রন্থ হইতে প্রচুর উদ্ধাহরণ তুলিয়াছেন। “বোধ হয়, অমুরূপ উদ্ধাহরণ বাঙ্গালার, রাজের লালালার পান নাই। সর্বনামপদের, কারকের ও ক্রিয়াবিভক্তির রূপভেদ দ্বারা বুঝিতেছি, আবিষ্কৃত পুথীর ভাষা “খাটি” নাই, হুঁই তিন সময়ের হুঁই তিন দেশের ভাষা মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। একটা প্রমাণ দেখুন,—‘করিবাক’, ‘করিবারে’, এক সময়ে এক দেশে চলিতে পারে না। এই দুইএর মধ্যে বোধ হয়, ‘করিবাক’ পুরাতন। ‘করিতে’ আধুনিক। ‘করিবারে’ অপেক্ষাকৃত পুরাতন।

সন ১৩১২ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার উক্ত স্তরেস্তবাবু "বঙ্গপুরের দেশীয় ভাষা" নামে বাঙ্গালী ভাষার কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়াছিলেন। তাহাতে দেখিতেছি, (১) কর্তাকারকেব বিভক্তি 'এ', (২) কর্তাকারকেব 'ক', (৩) করণ ও অধিকরণেব 'ত' হয়। "কৃষ্ণকীর্তনে" এই এই বিভক্তি আছে, অল্প বিভক্তিও আছে। অতএব বুঝিতেছি, প্রাপ্ত পুঁথী, দেশান্তর এবং কালান্তর দেখিয়াছিল। দেশান্তর অস্বীকার করিলেও কালান্তর স্বীকার কবিতে হইবে।

(ঘ . ভাষা-বিচার

১২। ভাষাব দুই অঙ্গ, শব্দ ও ব্যাকরণ। এই দুই অঙ্গের পৃথক্ পৃথক্ আলোচনা দ্বারা ভাষাঙ্গান পূর্ণ হয় না। এখানে সে দুই মিলাইয়া ভাষাব বিচার কবি। গ্রন্থ হইতে কয়েকটা পদ উদ্ধার কবি। দেখা যাইবে, এক সময়ের এক কাবর লেখা নচে।

• (ক)

(১) যাই যমুনার পাণিকে আইস

সখি মোব সঙ্গ।

যমুনা জলে কুস্ত ভরিঅঁ

আসিব এ বড় রক্তে ॥

হেন বুলা রাধা কলসী লজা

জাএ গজগড়ি ছান্দে।

আলকেঁ শোভে বদন তাহার

যেহেন কলঙ্ক চান্দে ॥—(২৪০ পৃঃ)

'যাই' ও 'জাএ' পুঁথীর বর্ণান্তর। 'অলকে' স্থানে 'আলকেঁ' ভাষার দেশান্তরীয় পরি-
~~বর্তন~~। কর্তাকারকে 'এ', কর্তৃ 'ক', অধিকরণে ও করণে 'ত' নাই। রাঢ়ের ভাষা। বিশে-
বতঃ 'গজগতি' স্থানে 'গজগড়ি'। কিন্তু উদ্ধৃত পদ সাড়ে পাঁচ শত বৎসরের পুরানা কি ?
আড়াই শত, কি তিন শত বৎসর পর্যাপ্ত মনে হয় না ?

(২) হের চন্দ্রাবলী রাধা মার বুলাবনে।

কুহুম সমূহে শোভে সব তরুগণে ॥

তাত অললিত ভ্রমরের রোল।

আছুক মাহুঁষ দেবলাক গড়ে ভোল ॥—(২০৯ পৃঃ)

'তাত'—তা-তে হইলে বর্তমান লেখ্যভাষা হইত না কি ?

(৩) যদি কিছু বোল বোলসি তবে

দশন-কটি তোদ্বারে।

হরে হরুবার ভর আদিকার

সুন্দরি রাধা আনন্দুরে ॥

তোক্ষাব বদন সংপূন চান্দ

আধর আর্মির্জা লোভে ।

পবতেথ মোর নয়ন চকোর

যুগল নিশ্চল শোভে ॥--(২১৭ পৃঃ)

‘অ’ স্থানে ‘আ’, এবং দুইটা অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু না থাকিলে তাহা দুই তিন শত বৎসরের মনে হইত ।

(৪) ঈশী হারায়ির্জা কারু মনে খেদ কবে ।

তাহাক চাহির্জা কারু বুলে ঘবে ঘরে ॥

মাখাত হাধ দির্জা কাদন্তি গদাধবে ।

তাহাক গুণির্জা বাধা পায়িল বড় ডরে ॥

মণত গুণির্জা পাছে দেব চক্রপাণী ।

দুঈ হাথে মুচ্ছিলান্ত নয়নের পাণী ॥

তবেঁ সব কহিলাস্ত বড়ায়িব থানে ।

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥--(৩১২ পৃঃ)

ইহার ভাষা ও (১) (২) এর ভাষা এক কি? আমার বোধ হয়, সকল পদ এক কবির রচিত নহে । নূতন নূতন গায়ন নূতন নূতন পদ রচিয়া বড়ু চণ্ডীদাসের নামে চালাইয়াছিলেন । সমুদয় পদের ভাষা সমান বোধ হয় না । নীচের পদের ভাষা (১) (২) সহিত তুলনা করুন ।

(৫) মেদনি ঘোড়িলো হালে ।

কৌণো ব্রজার দণ্ড যৌআলে ॥

গোআলী বাকিলো বাসুকী দড়ী ।

গিরি করিলো মোখড়া গোবালী ॥

* * * *

স্বমেক আক্ষাক গড়ে ।

তার শূঙ্গে মোর মেড়ে ॥

নাম মোর বনমালা ।

হেলোঁ দলিবৌ কালী ॥

গোকুলে গোজাতী ।

দেহ আক্ষারে স্বরতী ॥--(৪২ পৃঃ)

এই পদ ধরিয়া দুই এক কথা লিখি । এখানে ঘোড়ি-লো স্থানে ঘো-ড়ি-লোঁ হইবে । মে-দ-নি বানান কবির, না লিপিকরের? টীকাকার লিখিয়াছেন, “ ‘মেদনি ঘোড়িলো হালে, এবং ‘স্বমেক আক্ষাক গড়ে’ ইত্যাদি পদাংশ সহজিয়া হিঁয়ালীর মত কাণে বাজে ।” সহজিয়া হিঁয়ালী জানি না । ভাবে হিঁয়ালী নাই, ভাবার ও অলঙ্কার আছে । টীকাকার

লিখিয়াছেন, “উক্তিটি বক্তার অদ্বুত কৃতিত্বের পরিচায়ক।” অদ্বুত বটে। কারণ, তিনি মেদিনীতে হল বোজিত করিলেন। গোবন্ধনরজ্জু হইল বাসুকী, যুগকীলক হইল গিরি, আব যুগ হইল ব্রহ্মার (পাঠে ব্রহ্মা-ক নাই কেন ?) দণ্ড। বক্তাব কৃষির বার্তা পাওয়া গেল। তাঁহার মণ্ডপ কোথায় ? সুমেরুপর্বত তাঁহার গড়, পর্বতেব শিখর মণ্ডপ। কবির উৎপ্রেক্ষা, সপ্তদ্বীপা সপ্তসমুদ্রা মেদিনীর অত্যাচ্চ পর্বত অবিকল হুর্গ হইয়াছে। হিঁয়ালী নাই। হিঁয়ালী এই যে, তখনও কালিয়দমন হয় নাই, কবি বা বক্তা পূর্বেই তাহা জানাইয়া দিয়া কৃতিত্বের তালিকা পূর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু এত সব কৃতিত্ব স্ববর্ণ কেন ? আলঙ্কারিক অনোচিতাদোষ ধরিলেন না কি ? (‘গোকূলে গোচ্ছাতী’ ইহার অর্থ বুঝিলাম না।) দ্রষ্টব্য, মে-দ-নি, কো-মৌ, আ-চ্ছা-ক (আচ্ছা-র), গো বা-লী (গো-বালী = গোআলী), এইরূপ শব্দ ও বিভক্তি উদ্ধৃত অপর পদ্যংশের তুল্য নহে।

২০। কবি বৃন্দাবনে নানা দেশের গাছ বসাইয়াছেন। সব গাছ চিনিতে পারিলাম না, চেষ্টাও করিলাম না। একে গাছগুলির চলিত নাম, তাহাতে গায়নের মুখে বিকৃত হইয়া অচেনা হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি দেখা যাইবে, কোন কোন গাছ ছইবার আসিয়াছে। মূল কবি এত অসাবধান হইতে পারেন না। ছইবার নাম করা গায়নের কর্ম। কবিকল্প কালকেতুর পুরীনির্মাণ সময়ে বনেব বহু গাছের নাম করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী গায়ক কবির তালিকা বাড়াইয়া দিয়াছেন। “শূন্তপূরণে”ও সেই দশা। “কৃষ্ণকীর্তনে” শূন্ত বাবতীর বৃক্ষনাম পর্যালোচনা করিলে কবির দেশ চেনা অনস্বব হইবে না। “শূন্তপূরণে” এক ‘শুভ্রার বাধারী’ পড়িলেই বুঝি, উহাব অন্ততঃ কিয়দংশ রাঢ়ের কবির নহে। গাছের শোনা কিংবা পৃথীতে পড়া নাম কবির কলমে বা মুখে বাব বাব আসে না, চেনা জানা নাম বাব বাব আসে, উপমাতোও আসে। “কৃষ্ণকীর্তনে” কবিপ্রসিদ্ধ উপমা ছাড়া একটা এইরূপ উপমা আছে। শৈল-গগন-মহল’। রাধিকার গগনময় কুটুম মহলেব (মহলআব ফুলের) সহিত উপমিত হইয়াছে। আমার জানা-শোনা উপমায মহল একেবারে নূতন। মহল ঘটাকার ও চম্পক-বর্ণ। রাধিকার বর্ণে মিল হইয়াছে; গণ্ডেব আকারে মিলিয়াছে কি না, জানি না। হয় ত কবি নারিকার ফুল গাল স্তম্ভর মনে করিতেন। সে বাহা হউক, এই এক উপমা হইতে বুঝিতেছি, কবির নিবাস বাকুড়া। বীরভূমও হইতে পারে। এখানে গাছের টাকার বিচার করিব না। একটা গাছ কু-ডু-ম আছে। ইহা স° ধূলি-কদম্ব, বা° কেলি-কদম। কিন্তু কু-ডু-ম বা কু-কু-ম সাঁওতালী নাম। সাঁওতালী নাম পাইয়া বুঝিতেছি, কবি সাঁওতাল-পরগণার নিকটে ছিলেন। কিন্তু সে কবি কে, যিনি আঁ-ব, আঁ-ধ, আ-ধু, এই তিন নামে আমগাছ বৃন্দাবনে তিন বার বসাইয়াছেন ? আমগাছ জা-ধু নামে ছইবার, ডা-লি-ধ ছইবার, জা-ক জা-কা ছইবার, ছা-ক্রি-রগ ছা-তী-অ-ন ছই নামে একই গাছ ছইবার, ম-ছ-ন ছইবার, বা-ল-তী ছইবার, ইত্যাদি বৃন্দাবনের কি ছই অংশের বর্ণনা ? অ-ধু-ন নাম স°। ইহার আর এক স° নাম ক-কু-ত। ইহার অপভ্রংশে মানভূমে ‘কো-ধ’, “কৃষ্ণকীর্তনে” বৃন্দাবনে

কু-হ-র (রাগ নামে ক-কু, ক-হ)। কিন্তু বৃন্দাবনে ছুই নামে ছুইবার কেন ? বোধ হয়, মূল কবি একবার লিখিয়াছিলেন, গায়ন পালা বাড়াইতে গিয়া আর বার আনিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বৃন্দাবনের অযোগ্য কা-ল-কা-হু-ন্দা, হি-দ্বী, ধ-র-মু-জা, কা-হু-ডী, কু-শি-আ-র (ইকুভেদ) প্রভৃতি বহু ও গ্রাম্য গাছেব নাম কবিয়াছেন। গ্রাম্য শ্রোতা দীর্ঘ তালিকায় এক প্রকার বস ভোগ করে। ইকু অর্থে কু-শি-আ-র নাম রাঢ়ে অজ্ঞাত। সে কালে কি এই নাম চলিত ছিল ? সব গাছ চিনিতে চেষ্টা কবিলে পূর্বা বা উত্তরবঙ্গের নাম আরও পাওয়া যাইতে পারে। আ-না-র-স নূতন আনা। কিন্তু আ-তা ও পে-য়া-বা লুকাইয়া আছে, কি একেবারেই নাই, তাহা বুঝিতেছি না। যদি একেবারে না থাকে, তাহা হইলে বৃন্দাবন পুরাতন। কিন্তু কত পুরাতন, কে জানে। আরও দেখিতেছি, মা-ল-তী নামে রাণ্ডে মালতী লতা গাছ হইয়াছে।

২১। “কৃষ্ণকীর্তনে” কয়েকটা বাবনিক শব্দ আছে। যথা, কামান, থন্দ, খাঁখাব, গুলাল, বাকি, মজুবি, মজুবিআ, এবং হয় ত আফার। প্রত্নাত্মবোধী বঙ্গদেশের ইতিহাসের উপাদান খুজিতেছেন, কেহ কেহ সে উপাদান ইতিহাস নামে প্রকাশ কবিতেছেন। তবে বোধ হয়, এইটুকু স্থির হইয়াছে, খ্রীষ্টের ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে রাঢ়দেশ মুসলমান অধিকারে আসে নাই। “কৃষ্ণকীর্তনে”র সংস্কারক ও লিপি-বিচারক, উভয়েই বলিয়াছেন, এই পুথী (প্রাপ্ত পুথী, মূল নয়) চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লিখিত হইয়াছিল। যদি মূল পুথী ও প্রাপ্ত পুথীর বঙ্গস একই ধরি, তাহা হইলে বলিতে হইবে, এক শত দেড় শত বৎসরের মধ্যে কবিকুল ধ-হু ছাড়িয়া ফা° কা-মা-ন ধরিয়াছিলেন, প্রজাকুল জমির খাজনা করিতে গিয়া থ-ন্দ ও বা-কি লিখিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু থা-খা-র, শু-গা-ল ও ম-জু-রি এরূপ শব্দ নহে। সে কালে মুসলমান রাজা গাঁয়ে গাঁয়ে মক্তব বসাইয়াছিলেন কি ? বা°-তে ছুই অর্থে থা-খা-র বা থা°-খা-র শব্দ চলিত আছে। (১) কাসিলে উদ্গত স্নেহা। ইহার মূল স°। (২) অঙ্গার—ব°। হইতে কলঙ্ক, অপমণ। যেমন, ‘কুলের থা°-খা-র’। আমার বোধ হয়, ইহার মূল কা° থা-ক—অঙ্গার, + স° কা-র = থাক° + আ-র = থা-খা-র; যেমন ছাই-পাঁশ। মনে হইতেছে, কবিকল্পে ছুই অর্থ স্পষ্ট আছে। সে বাহা হউক, কিছু কাল গত না হইলে ঘরের

* কা-মা-ন শব্দ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হইয়াছে। কা° ক-মা-ন ধনু, এবং কা° কবিও নামকের ঐ মননের ধনু মনে করিতেন। নয়ন-বাণ তাঁহারও জানিতেন। কিন্তু হিন্দু কবির কা-ম-ধ-নুও ত ছিল। “কৃষ্ণকীর্তনে” (৩২ পৃঃ), ‘জহি কামধনু ময়র নামে’ আছে। স° কা-ম-ধ-নু শব্দের সংক্ষেপে কা-ম-হ-ন—কা-মা-ন যে হয় নাই, তাহা বলা কঠিন। কবিকল্প (“বঙ্গবাসীর”) লিখিয়াছিলেন, “অতসী কুহম তমু জুহুগ কা-ম-ধ-নু”। (অসে ভিন শত বৎসর পূর্বেই অতসী কুহম গীতবর্ণ হইয়াছিল।) মৈথিল কবি উমাপতি “পূর্ণিমাভ-দ্বয়” নাটকে লিখিয়াছিলেন, ‘বৈষ্ণ-কমান বিলোকন বাসে। বেদহ বিদ্যুৎধিকর গমবাধে।’ বিভাপতি ঠাকুরের ঐদীর শত বর্ষ পূর্বে উদ্যাপতি ছিলেন। তত্ কালে মিথিলার মুসলমান কবির এতাব বর্ণিত ছিল কি ? কে জানে। কা-মা-ন একবার চলিলে আর তর থাকে না। জাহান্না, ‘কা-ম-কা-মা-ন জুহুগ’। এইরূপ বহু কবি।

কথার মধ্যে ফা' শব্দ চলিত হইতে পারিত না। এক শত বৎসর পৰ্য্যন্ত কি? শু-লা-ল শব্দের মূল কা' শু-লা-লা—পুষ্পগুচ্ছ—মনে কবি। বহু পুষ্পের একত্র সমাবেশে শু-লা-ল, যেমন শু-লা-ল তুলসী। মূল স'-ও হইতে পাবে। শু-ল, গোল, বৃত্তাধার পুষ্প বলিয়া শুল+বা' আল, যেমন কদম্ব, গৌ-দা কিংবা মোতিয়া বেলা। “কৃষ্ণকীর্তনে” ‘গুলাল মাল্লী’, ‘গুলাল মালতীমালা’ আছে; আর আছে ‘নথরনিকর দেখি গুলালে’। শেষোক্ত উপমা হইতে বৃষ্টি, শু-লা-ল এমন ফুল, যাহাব গোছা হয়। অতএব ফা' ব্যুৎপত্তি ধরিতে হইতেছে। তা ছাড়া, “কৃষ্ণকীর্তনে” তু-ল-সী নাম কোথাও নাই। কৃষ্ণতুলসীর ফুলের সঙ্গে মথের আরজিমাণ্ড সূচনা কবিতেন। (টীকাধার তমালসদৃশ পুষ্প মনে করিয়াছেন। তিনি বৃক্ষ-ভেদ বলিয়া কাস্ত খাকিলেই ভাল কবিতেন। ইংবেজী বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়ার অনেক স্থলে ঘা-নয় তাই হইয়া গিয়াছে।) যদি বা শু-লা-লে সন্দেহ থাকে, ম-জু-রি ও ম-জু-রি-আ শব্দে কিছুই নাই। “কৃষ্ণকীর্তনে” এই দুই শব্দ পাইয়া আশ্চর্য হইয়াছি। কারণ, বীরভূম, খাকুড়া প্রভৃতি দক্ষিণরাঢ়ে এই দুই শব্দ প্রায় অপ্রচলিত আছে। লোকে বলে, মু-নি-ব। কবিকল্পে আছে, বে-র-গি-রা। বোধ হইতেছে, বাকুড়ায় বে-ব-গি-রা বা বে-ব-ণ এখনও চলিতেছে। যদি মনে করি, সাড়ে পাঁচ শত বৎসর পূর্বে বীরভূমে ম-জু-বি, ম-জু-বি-আ চলিত ছিল, তাহা হইলে কিছু কাল পবে লোকে কি ফা'-মূলক শব্দ ভুলিয়া গিয়া স'-মূলক ধরিয়াছে? ফা' শব্দটি ম-জু-হর। উহা অপভ্রষ্ট হইয়া ম-জু-ব, ই-যোগে মজুবের কর্ম; তাহাতে বা' ইআ প্রত্যয় করিয়া ম-জু-রি-আ। এত করিয়াও রাঢ়ে অজ্ঞাত হইয়া রহিয়াছে। “কৃষ্ণকীর্তনে”র “ভারখণ্ডে” ও “ছত্রখণ্ডে” ম-জু-রি ম-জু-রি-আ আছে। দেখিতেছি, এই দুই খণ্ড কবিত্তে অধম। উত্তরবঙ্গের কোনো গায়ন এই দুই খণ্ড জুড়িয়া দিয়াছেন কি? আ-কা-র শব্দ ঠিক বৃষ্টিতে পারিতেছি না। এক স্থানে (২০ পৃঃ) আছে, ‘পালাইলো দান আ-কা-রা জাএ, পাইলো মূল আ-কা-রে।’ যমুনার ঘাটে কৃষ্ণ দান (শুক) সাধিতে বসিয়াছেন। রাধা দান না দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন, ‘পালাইলে কি হইবে, দান এড়াইতে পারিবে না; মূল্য পাইলেই আ-কা-র, প্রচুব পাইলাম।’ অন্য স্থানে (২৮৫ পৃঃ), ‘বড়ারি মোর লাঠে বন্ধন সার। আছুক লাভ মোব মূলত আ-ফা-র॥’ অর্থাৎ লাভের মধ্যে বন্ধন সার হইল; লাভ দূরে থাক, মূলে আফাব—? আর্বা বা-কে-র অর্থে প্রচুর। যদি প্রচুর অর্থ ধরি, মূলে প্রচুর; অর্থাৎ মূলেই প্রতুল, লাভ দূরে থাক। টীকাকার দুই স্থলে দুই ব্যুৎপত্তি করনা করিয়াছেন। ব্যুৎপত্তি এক হইলে বৎ কথা থাকিত। বাবনিক হইলে অস্ত্র দিকে বাধা পড়ে। পুখীখান অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইয়া পড়ে। কোন্ কুল সামলানো যাইবে?

২২। বলা বাহুল্য, তিল কুড়াইয়া ভাল করা যাইতেছে। এমন কথা নয়, এইখানি অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলে আঁদার কোনো অভিসন্ধি সিদ্ধ হইবে। কোন্ বাঙ্গালী চণ্ডীদাসের উৎকর্ষে অসহিষ্ণু হইতে পারে? কিংবা কোন্ বাঙ্গালী পাঁচ ছয় শত বৎসরের

পুরানো পুথী পাইলে নিবানন্দ হয় ? কিন্তু সোনা নামে পিতল লইতে চাই না ; সোনা কি না, তাহা আগুনে পোড়াইয়া, নির্ভর পাবাণে কথিয়া, আর হত প্রকারে পারি, পরখিয়া দেখিতে চাই। কেবল আশি নই, সকলেই দেখুন। এ বিষয়ে টীকাকার একটু বিষ ঘটাঁইয়াছেন। টীকার ভাষণ কণ্টকের বেড়া ভেদ করিতে না পারিলে সকল পাঠক গ্রন্থে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। গ্রন্থ চারি শত পৃষ্ঠা, টীকাও প্রায় তত! ভাবে কঠিন নহে, গ্রন্থের ভাষা যথোচিত প্রাঞ্জল। দোষ, অজস্র বর্ণান্তর, অজস্র ব্যাকরণান্তর। গায়ন বোধ হয় নাকী সুরে গাইতেন। এ কারণ অজস্র চন্দ্রবিন্দু। এ লিখিয়াও সন্তোষ নাই, তত্বপরি চন্দ্রবিন্দু। সাধারণ আসামী ভাষায় নাকি নাকী সুর একটা প্রবল লক্ষণ। টীকাকারের উৎপীড়নও অল্প নহে। চন্দ্রবিন্দু কিসের জ্যোতক, কিংবা হ-এ পদে ‘হ’ দাতু কি না, কিংবা মা-এ-র অর্থে ‘মা’র’ (?) লিখিবার ছাপাইবার নিরীহ পাঠককে পড়াইবার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলাম না। ইহার উপর উদাহরণের প্রাচুর্য। উদাহরণও প্রায় যে-সে পুথী, ছাপা অ-ছাপা, জানা অ-জানা পুথী হইতে তুলিয়া বিশেষ লাভ হয় নাই। উদ্ধৃত পুথীর কবি, কাল, ও দেশ না জানিলে উদাহরণের সার্থকতা থাকে না। টীকাকার এ সম্বন্ধে নির্বাক থাকিয়া ভাল করেন নাই। একথান পুথিতে, কোথাকার কবেকাবে কে জানে, একটা পদ আছে। তাহা দেখিয়া “কৃষ্ণকীর্তন” বুঝিবাব আবশ্যকতা বুঝিতে পারিতেছি না। বাস্তবিক দ্রুত হইতেছে, টীকাকার প্রয়োজন বিস্মৃত হইয়া বৃথা পরিশ্রম করিয়াছেন। পুথীর বানান দোষ, বিভক্তি-দোষ বহু কষ্টের কারণ হইয়াছে।

২৩। বোধ হয়, উদ্ধৃত উদাহরণেব অনেকগুলি আসামী। ইহাতে মনে হয়, টীকাকার জানা বাজালা পুস্তকে অমুরূপ উদাহরণ পান নাই। তাঁহাব পরিশ্রমের অবধি ছিল না, অথচ আসামী ভাষাধারা বাটীর ভাষা বুঝিতে হইয়াছে। ইহাতে দুই অসুখান হয়। (১) আসামী ও পুরাতন বাজালা ভাষা এক ছিল, (২) “কৃষ্ণকীর্তনে”র পুথী আসামী ভাষার দেশ বুঝিয়া আসিয়াছিল। প্রথম কল্পনা পরে বিচার করিব। দ্বিতীয় কল্পনার পক্ষে আসামী ভাষার রচিত (১) “নাবায়ণ কবচ” ও (২) “কলঙ্কভঞ্জন” হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধার করি। এই ভাষার সহিত কৃষ্ণকীর্তনের ভাষার সাদৃশ্য স্পষ্ট। বই দুইখানি ছাপা হইয়াছে, বোধ হয় ভাষাও কিছু আধুনিক হইয়া পড়িয়াছে।

- (১) শুক নিগদতি শুনা’ স্তম্ভদ্রার নাতি।
 বিশ্বরূপে’ এহি অঙ্গীকার করি আতি’ ॥
 নবগণে’ ববিলা ভৈলন্ত’ পুরোহিত।
 রিলন্ত’ কার্য যত গুরুর বিহিত ॥
 নজুরক’ রক্ষা করে গুরুর বিজাই।
 গাক’ নী করিবাক’ দিলন্ত উপার ॥

নারায়ণ কবচ দিলন্ত' বাসবক' ।

যাক' পাইয়া ইচ্ছা' সব জিনিলা' দৈতক' ॥

(২) বর তিব্বী' লোভি তোক' বুজিলো' নিশ্চয় ।

পর তিব্বী ধর্ম কিয় নষ্ট কর তই' ॥

এতিক্ষণে বাইবোহোঁ' যশোদার ঘরে ।

কহিবোহোঁ' সব কথা দেখাবোহোঁ' তোরে ॥

এক দিনা নষ্টচক্ষু উদয় হইল ।

দেখোঁ' বুলি' ভয়ে কোনো বাহিব নাহিল ॥

হেন সময়ত' কাথে কলশীক' লই ।

যমুনাত' জল আনিবাক' যাও' মই ॥

সাধিকাক' চাই হরি বুলিল' বচন ।

চিন্তা নাই অপযণ কবিবো' মোচন ॥

২ । কবি, কাল ও দেশ

২৪। “কৃষ্ণকীর্তন” পুথীর কবির নাম অ-ন-স্ত। ইনি নিজকে ‘বড় চণ্ডীদাস’ নামে আখ্যাত করিয়াছেন। ইনি বা-স-লী দেবীর ভক্ত ছিলেন। পুথী হইতে ইহার অধিক কিছু জানিতে পারা যায় না। (পুথীব কোথাও বা-স-লী বানান নাই।)

অ-ন-স্ত নাম অসাধারণ নহে। বা-স-লী (বা বা-শ-লী) ঠাকুরাণীও অসাধারণ নহেন। অনস্ত কবি বাসলী চণ্ডীর উপাসক ছিলেন। আর কেহ ছিলেন না, তাহাও জানি না। ঐশ্বর্যের কথা, চণ্ডীর উপাসক হইয়া চণ্ডীর কীর্তন না গাইয়া কৃষ্ণের কীর্তন গাইলেন। ইহার রহস্য জানি না। শুধু চ-ণ্ডী-দা-স নহেন, ব-ড় চণ্ডীদাস। ব-ড় বিশেষণ হইতে বুঝি, কবির গ্রামে আর এক চণ্ডীদাস ছিলেন। ইনি ব-ড় ছিলেন না। স- ব-টু হইতে ব-ড়। ব-টু অর্থে ব্রহ্মচারী (বৃ- বটুকরণ—উপনয়ন)। “শ্রুতপুরাণে” ব-ড় অর্থে ব্রহ্মচারী, অবিবাহিত ব্রাহ্মণ। ব-টু শব্দের আর এক অর্থ, মাণবক, অবজার বালক বা কিশোর। পুরীর মন্দিরে জনকরেক ব-ড় আছে। তাহার পুত্র উপকরণ জোগাড় করে। জুবনেবরে ব-ড় নামে এক সম্প্রদায় আছে। ইহারাও ব্রাহ্মণ নয়। বোধ হয়, পূর্বকালে অবিবাহিত কুমার পুজাহারী হইত। তাহাদের বংশধর এখন সেই বড় নামে চলিতেছে। চণ্ডীদাস এইরূপ ব-ড় উপাধিযুক্ত ছিলেন। নিশ্চয়ই সন্ধান-সূচক উপাধি। মতুবা কবি নিজ নামে যুক্ত করিতেন না। (বর কিংবা ব-ড় হইতে ব-র-জা কিংবা বড়-জা শব্দ হইত, ব-ড় হইত নী।)

২৫। কবি কথার কথার ‘লক্ষ’ গণিয়াছেন। ইহা ধনবানের লক্ষণ নহে। একটা হুসাহসের কথা লিখিতেছি, অনস্ত কবি অতিশয় দ্রোম্য ছিলেন। তাহার গ্রাম, অশিষ্ট;

ভাবে গ্রাম্য, অশিষ্ট। বহু কবি আদিরসপ্রধান গ্রন্থ রচিয়াছেন, কিন্তু সে রস শব্দের যজ্ঞনা দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। অনন্ত কবির নিকট স্ব-শব্দ-বাচ্যতা দোষ বাধিত না। রাড়-চোরাড়ি দেখিয়া বুঝি, কবি রাধাকৃষ্ণসংবাদ গ্রাম্য হুঃশীল কিশোর-কিশোরীর অনুরাগের তুল্য মনে করিয়াছেন। কথায় কথায় কৃষ্ণ যে ত্রিংশ-ঈশ্বর, তাহা আছে বটে, কিন্তু ভক্তির চিহ্ন নাই। কবি সংস্কৃত শ্লোক রচিয়াছেন, অগণ্য সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু নামক-নামিকার যে সব আকার-ইজিত সংস্কৃত কাব্যে বর্জনীয় বিবেচিত হয়, সে সবের প্রাচুর্য্য করিয়াছেন। সংস্কৃত কাব্যের রীতি নাই মাহুন, ভাব্যতার রীতি উত্তম কবির স্বাভাবিক লক্ষণ।

কবি লিখিয়াছেন, শ্রীধাম, বৃদ্ধ, ও কক্ষীর পর কৃষ্ণ অবতার। সংস্কারকেব মতে “চণ্ডীদাসের উক্তি ভিত্তিহীন বলিয়া এক ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না।” কিন্তু যত দিন এই নূতন কথা পুরাণে না পাই, তত দিন কবির উক্তি পোত-হীন বা সংশয়াজ্বল বলিতে হইবে। জয়দেবে ধৃত-দশ-বিধ-রূপের কক্ষী রূপও গত হইয়াছে। অনন্ত কবি হয় তাঁ অসাব-ধানে জয়দেব অমুকরিতে গিয়া ভ্রমে পড়িয়াছেন। তিনি জয়দেব কবির ‘রদসি যদি’-র বালালা আবৃত্তি করিয়াছেন। আবও ছুইটা পদের বালালা কবিয়া লইয়াছেন। কোনো বড় কবি অল্প কবির পদ এমন চুরি করেন কি? চুরি বলিতেছি; কারণ, গানের ভণিতায় জয়দেবের নাম নাই, আছে “বাসলী চরণ শিবে বসিআ, গাইল বড় চণ্ডীদাসে ॥” অনন্ত কবি নারদ-মুনিকে উপহাস করিয়াছেন, “বামন শরীর মাকড় বেশ”, “বাঅ কাঢ়ে যেন বোকা ছাগ”, “দেখিআ কংসেত উপজিল হাস ॥” কবির নিকট যোগীষ যোগও উপহাসের বিষয় হইয়াছিল। রাধা বিরহে কাতরা। পূর্বপ্রত্যাত্থান-রূপ অপরাধ (?) অরণ করিয়া কৃষ্ণ বলিলেন, তিনি দিবানিশি যোগ ধ্যান করেন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞান পাইয়াছেন, ইত্যাদির সহিত যোগের ছই একটা আনা বুলি শুনাইয়া দিলেন।

২৬। কি জানি কেন, অনন্ত কবিকে নারদের চণ্ডীদাস মনে করিতে ক্রেশ হইতেছেন উভয়ের মধ্যে এত বিরোধ চোখে পড়িতেছে যে, অনন্ত-কে একজন বড় গাঙ্গীয়ে, এবং নারদের চণ্ডীদাসকে একজন অষ্টা-কবি মনে হইতেছে। কবি না হইলে কাব্যসমালোচনা নাকি বিভ্রম। এই হেতু সংস্কারক সমালোচনা করেন নাই। আমিও কবি নই; কিন্তু তাই-কেই কবি বলি, যিনি আমার মতন নিঃস্পৃহ অকবি পাঠকেও কবিত্বসাম্রাজ্যে প্রেরিত করেন। সত্য কথা বলিতে কি, “বাসলীগণ বড় চণ্ডীদাস”, এই ভণিতার ফাঁপরে কেলিয়াছে। “কৃষ্ণকীর্তন”র ছন্দের মাথুর্থে চমৎকৃত হইয়াছি, মুগ্ধ হইয়াছি; কিন্তু এমন রস, এমন ‘জীব’ অন্ন পাইয়াছি, বাহা বসন্তে পশির’ থাকে। ইহাতে প্রায় চারি শত পদ বা গীত আছে। ‘সকল পদই যে তুচ্ছ মন্থণা,’ এ কথা কেহ বলিবে না। কিন্তু পণ্ডিতে ‘বলিলে করটা পদে উত্তম কাব্যের লক্ষণ পাওয়া যাইবে? অর্ধেক?

২৭। আমার পুণী বর্দ্ধিমা যাইতেছে, কিন্তু আর একটু মা বাড়াইলে চণ্ডীদাস-নাম-লুক কৃতান্তেব-শ্রম সংস্কারক-মহাশয়ের প্রতি স্মরণ করা হয়। “কৃষ্ণকীর্তন” অন্ন-ধন দেখি।

গোকুলে কৃষ্ণ জন্ম লইলেন, বাড়িলেন। বৃন্দাবনে গিয়া নিত্য নিত্য গোবৎস রাখিতে লাগিলেন। এ দিকে রাধাও তাঁহার বড় আয়ী ও সখিজন সঙ্গে মথুরায় দধি-দুধ বিকিতে বৃন্দাবনের পথ দিয়া নিত্য বাতায়ত করিতে লাগিলেন। এক দিন রাধা এক পথে, বড়ারী অল্প পথে গিয়া পড়িলেন। বড়ারী রাধার অন্বেষণ করিতে করিতে কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত। বড়ারীর মুখে রাধিকার রূপকথা শুনিয়া কৃষ্ণ পরাণ ধরিতে পারিলেন না। বলিলেন, “রাধিকা মানাআঁ দেহ মোরে ॥” এইরূপ ছই এক কথায় নায়কের পূর্বরাগ সমাপ্ত। (জানি না, কবিকুল নায়কের না নায়িকার পূর্ববাগ প্রথমে বর্ণনা করেন।) কৃষ্ণ, ফুল ও পান বড়ারীর হাতে রাধার নিকট পাঠাইলেন। দ্বিতী কৃষ্ণের “পাঁচ অবস্থা”ও জানাইলেন। কিন্তু রাধিকার অমুরাগ দূরে থাক, ফুল পান দূরে ফেলিয়া রোষে দ্বতীকে চড় মারিলেন। শুনিয়া কৃষ্ণের অপমানবোধ যেমন, ক্রোধও তেমন হইল। তিনি রাধাকে হুঃখ দিতে উপায় চিন্তিলেন। দ্বতীকে বলিলেন, যমুনার ঘাটে রাধাকে রাখিয়া, “লুটিআঁ সব পসাব খাইবো দধি তাহার, কাচি লৈবো সাতেশরী হার ॥ বাটেত সৃজিয়া দান, করি তার অপমান, তোর মোর সাধিব মান ॥” ভবিষ্যতে আর কি করিবেন, তাহাও দ্বতীকে বলিয়া দিলেন। “পাছেত মরন বাণে হাণিআঁ তাক পরাণে, রহিবো ধরি মুনিবেশ ॥” এটা কিন্তু গানের শেষ পালা।

২৮। জানি না, কৃষ্ণ কেমন নায়ক। চারি জাতি নায়কের কোন জাতি? ধূর্ত নয়, শঠ নয়; পঞ্চম জাতি, দান্তিক অহঙ্কারী। ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া প্রণয়কামনা “কৃষ্ণকীর্তনে” নূতন। কৃষ্ণ নিজের বড়াই, তিনি যে দেব চক্রপাণি, দেব বনমালী, ত্রিদশের পতি, ইত্যাদি তাহার যত কিছু গরিমা হাটে বাটে আবৃত্তি করিতে ছাড়েন নাই। যত পদে এইরূপ বড়াই আছে, তাহার একটাও সঙ্গত নয়। রাধাকে ভুলাইতে এক দিন কৃষ্ণ রাধার দধির ভার বহিলেন, মোজে কাতরা রাধার মাথার ছাতা ধরিলেন। কিন্তু ইহাতে তাহার যে অপমান হইল, কৃষ্ণ ভ্রূহা ভুলিতে পারিলেন না, এমন কি, স্বর্গের দেবতারাও ক্ষুব্ধ হইলেন। নারীর ভার-বহন, নারীর বাধায় ছত্র-ধারণ! যমুনার তীরে বজ্রহরণের পালায় কৃষ্ণ রাধার পাটল ● বসনখাশি দিলেন, কিন্তু “সাতেশরী” হারটি চুরি করিলেন। রাধা যশোদার নিকট কৃষ্ণের রীত-নীত সব খুলিয়া বলিয়া দিলেন। মা পুত্রকে যথোচিত ভৎসনা করিলেন। পুত্র মায়ের কাছেও মিথ্যা কথা কহিতে ডরাইলেন না। কিন্তু অপমান পাইলেন। এমন উপায় করিলেন, বাহাতে রাধা তাঁহার পারে পড়ে। অপমানের প্রতিশোধ লইতে তিনি রাধাকে না কাঁদাইয়া ছাড়িবেন না। তিনি পুনঃ-পুনঃ স্বরণ করিতে লাগিলেন, রাধা পান ফেলিয়া দ্বতীকে চড় মারিয়াছিলেন, ছাইকে নানাবিধ গাণি দিয়াছিলেন, তিনি রাধার দধিভার বহিয়াছিলেন, তাহার কারণে কান্দিতহে স্বপ্ন দিয়াছিলেন, ইত্যাদি। তিনি মরনের পাঁচো বাণে রাধা বধ করিলেন।

* যে কবি ঋতলী-কৃত-স্বায় কৃষ্ণের পীতাম্বর, এবং চম্পক-গৌরী স্তুতায় লীলাধর বর্ণিতছেন, তাহার বর্ণনানুসারে : কিন্তু অল্প কবিরাধার পাটল বসনে সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন। ‘হরন পাটো-ল’ অর্থে পাটের লাল-সাদা কুসি।

ভাণ নহে, রাধা সত্য সত্য মূচ্ছিতা হইলেন, ১৫গাଁব শোক, কৃষ্ণেব শোক হইল। পরে ত্রৌষধ-পাপভয়ে অবশ্য বাধাকে জীয়াইয়া দিলেন। ইহাব পর, এক দিন কৃষ্ণ বাঁশীটি শিঅরে দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, বাধা বাঁশী চুবি কবিতা লইয়া গেলেন। এই কৌতুক বৃত্তিতে পারি, রাধাব পক্ষে বাঁশীটি বড় সুখেব ছিল না। কিন্তু বাঁশী হারাওয়া কৃষ্ণের যে “হাকন্দ ক্রন্দন” তাহা বৃত্তিতে পারি না। “মেঘ ঘেহ আষাঢ় শ্রাবণে। ঝরে তার পানি নয়নে গো ॥” ইহার পষ অকস্মাৎ বাধার বিরহ ও খেদ। কৃষ্ণের তেমনই নির্দয় উক্তি,

তোক্ষা ত লাগিঅঁ বাধা বড় পাইলোঁ দুখ।

চেন মন কৈলোঁ না দেখিবোঁ তোব মুখ ॥

এমন কি,

ছিনারী পামরী নাগরী বাধা।

কিন্তু রাধিকার নারীধর্ম কিছুই ছিল না, অক্লেশে গালি সহিয়া গেলেন। “কৃষ্ণকীর্তনে” নানের পালা নাই; আছে কৃষ্ণের প্রবল সাহস, অমুচিত আত্মপ্রাধা। আমাদের বোধ হইয়াছে, অনন্ত কিংবা আর কেহ নাহুরের চণ্ডীদাসের এবং অপর কবি ও গায়কের পদ একত্র করিয়া, কিংবা সে চণ্ডীদাসের পদের সহিত মিশাইয়া, নিজে পদ গাঁথিয়া চণ্ডীদাসের নামে বিকাইতে গিয়াছিলেন। অর্থাৎ “কৃষ্ণকীর্তন”, চণ্ডীদাসের ভাঙ্গা পালা। ইহাতে চণ্ডীদাসের ভাষা ও ভাব আছে, কি নাই; আছে মাত্র ভণিতা, বাহাতে তাঁহার অমুকায়ক ও অপহায়ক ধন্থ হইয়া গিয়াছেন। চারি শত পদের কোন্‌গুলি চণ্ডীদাসের নয়, বোধ হয়, তাহা চিরকাল অজ্ঞাত থাকিবে। কারণ, অপহায়ক চেনা পড়িলেও অমুকায়ক পড়ে না। “কৃষ্ণকীর্তন”র মধ্যে মধ্যে এমন পদ আছে, বিশেষতঃ “রাধাবিবহ” পালায়, বাহার কবিত্ব, জানা চণ্ডীদাসকেও যেন পরাজিত করিয়াছে। সাহিত্য-পরিষৎ ধন্থ, পৃথিব আবিষ্কারক ধন্থ, যিনি আমাদের মতন অকবিকেও কাব্য সমালোচনায় প্রবৃত্ত করিতে পারিয়াছেন। কবির চরিত নাই “জানি, তাহার জন্মশক নাই বা জানিলাম, কিছুই আসে যায় না। এই জ্ঞানে এ দেশের কোনো কবির চরিত কেহ লিখিয়া যায় নাই। যিনি কবি, তিনি নিজের কৃতিতেই নিজের চরিত লিখিয়া গিয়াছেন।

২২। এক মাস হইল, ২৫ ভাগের ৩-এর পরিষৎ-পত্রিকার শ্রী সতীশচন্দ্র-রায় মহাশয় চণ্ডীদাসের “কৃষ্ণকীর্তন” সমালোচনা করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার যেন পাণ্ডিত্য, তেমন স্বন্দর্শিতা প্রকট হইয়াছে। ইহা নূতন বার্তা নহে। তিনি একপুরুষকাল বৈষ্ণবপন্থাবলী-সমূহে মগ্ন করিতেছেন, বাঙ্গালীকে সুধাও দান করিয়াছেন। তাঁহার বিচার, যুক্তিহীন হয় না। কিন্তু একটা “কিন্তু” আছে। সে কিন্তুটি এই। তিনি ধরিয়া লইয়াছেন, “কৃষ্ণকীর্তনের পুঁথিখানা লিপিত্ব ও ভাষা-তত্ত্বের বিচারে খুঁটী চকুর্দশ শতাব্দীর রসিয়া হির” হইয়াছে। চুঃখের বিষয়, আমি “লিপিত্ব-তত্ত্বের বিচারে” মিসলেশ হইতে পারি নাই; আর একা সংকীর্ণক মহাশয়ের উক্তি ব্যতীত পৃথিব ভাবাত্তর ও অজ্ঞাত। বলা বাহুল্য, পৃথিব

দেশ কাল ও কবি যদি অসংশয়ে জানা থাকিত, তাহা হইলে তাহাকে আধার করিয়া অজ্ঞাত পক্ষ স্থাপনা চলিতে পারিত। কিন্তু প্রত্নলিপির সূচ্যে বৃহৎ অট্টালিকা টল-টল করিতেছে। আমার বোধ হয়, প্রথম পক্ষ স্বীকার কবাত্তে সতীশ বাবুকে অ-আকার্যের, রাঢ় বঙ্গের শব্দের ও বিভক্তির প্রাচীন সমতা করনা করিতে হইয়াছে। প্রথম পক্ষ অস্বীকার করিলে, তাহা সৰ্ব্বদে তঁাহার এবং আমার বিচার-ফল এক দাঁড়ায়। ঐক্য দেখিয়া বুঝিতেছি, আমার তর্ক নিতান্ত অসার নহে।

৩০। কিন্তু গ্রন্থের তাব সৰ্বদে অনৈক্য হইয়াছে। তিনি গ্রন্থে ব্যঞ্জনার প্রাধান্য দেখিয়াছেন, আমি লক্ষণাব দেখিতেছি। যদি বা ব্যঞ্জনা আছে, তাহা অধিধামুলা। সকল পদেই যে এই, তাহা বলি না। যে গ্রন্থে চারি শত পদ আছে, এবং বাঁধাতে নান্দ্রুয়ের চণ্ডীদাসের পদ এবং জয়দেবের ভাঙ্গা পদও আছে, তাহা ব্যঞ্জনাহীন হইতে পারে না। কিন্তু যে যে পদে কৃষ্ণের অপমান স্মরণ, বড়াই, ও উপায়চিন্তা আছে, সেসে পদ সতীশবাবু তাহাঁই “বৈষ্ণব-পদাবলী”-তে স্থান দিতে চাহিবেন কি? তিনি কোন্ কবিকে পরের তাব অনুবাদ করিয়া নিজের ভণিতা দিয়া চালাইতে দেখিয়াছেন? বলা বাহুল্য, কাব্যের বিচারকালে কবির নাম বিস্মৃত হইতে হইবে। তিনি লিখিয়াছেন, “দেখিলো প্রথম নিশি” ইত্যাদি একটা পদ ছাড়া চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত শত শত পদের “ভাষা কিংবা ভাবের একরূপ কোন সাদৃশ্য দেখা যায় নাই, বাহাতে উত্তর পদ এক জনের রচনা বলিয়া মনে করা বাইতে পারে।” তাহা হইলে বুঝি, (১) হয় প্রচলিত পদ অত্র কবির, (২) নয় “কৃষ্ণকীর্তনে”র পদ অত্র কবির। এই দুই বিকল্পের মধ্যে কোনটা প্রথমে গ্রাহ্য? প্রচলিত পদের অন্ততঃ কতকগুলি চৈতন্য-প্রভুর সময় হইতে অর্থাৎ চারি শত বৎসর চলিয়া আসিতেছে। চারি শত বৎসর পূর্বে যদি “কৃষ্ণকীর্তন” গুপ্ত ছিল, তবে হয় তাহা ছিল না, না হয় বঙ্গদেশে ছিল না। আমার বিশ্বাস, প্রকৃত কবি গুপ্ত থাকেন না। এখানে কাব্যিক কবি সৰ্বদে যে কথা, অত্র কবি সূরী সৰ্বদেও সে কথা। লোকে যেমন করিয়া হটক, নিকিৎ বর্জন, কিংকৎ সংশোধন, কিংকৎ পরিবর্তন করিয়া তাহাঁদিগকে জীবিত রাখে। দেশে এমন কি একদেশীয় বিশ্রব ঘটয়াছিল, বাহাতে “কৃষ্ণকীর্তনে”র পদগুলি বাছিয়া বাছিয়া অদৃশ্য হইয়াছিল? গান থাক; “অনন্ত” নামটাও কেহ জানিত না? অসম্ভাব্যও কখন কখন সম্ভাবিত হয়। কিন্তু বখন হয়, তখন কারণটা তুলকাথে এক কথার শেষ করিতে পারা যায় না।

৩১। এখন আর এক কথা। “কৃষ্ণকীর্তন” দেশান্তরী হইয়াছিল কি না। সতীশবাবু বলিয়াছেন, ইহার শব্দ, ক্রিয়া ও কারক-বিভক্তির সহিত আসাম, উত্তরবঙ্গ বা পূর্ববঙ্গের প্রচলিত অনেক শব্দ ও বিভক্তির সাদৃশ্য আছে। আমি পূর্ববঙ্গে বাই নাই। কিন্তু আমি যমে করিয়াছি, পুণী দেশান্তরী হইয়াছিল; তিনি বলিতেছেন, উক্ত সাদৃশ্য দ্বারা কৃষ্ণকীর্তনের “অসাধারণ প্রাচীনতা প্রমাণিত হইতেছে।” তাহার যুক্তি এই,—আসাম, এবং উত্তর পূর্ব পশ্চিম বঙ্গ প্রভৃতি সকল প্রদেশের ভাষার আকর এক। কাজেই “আদিম যুগে” উক্ত সকল

প্রদেশের ভাষা এক ছিল। যুক্তি অ-গ্রাহ্য নহে। তবে কি না, প্রবন্ধের আশ্রয়ে আমি বাংলা শাস্ত্র-প্রবৃত্তি বলিয়াছি, ইহা প্রায় তাই। শাস্ত্র-প্রবৃত্তি প্রয়োগ বিকোর্ণ। এক কথায়, উহা ছাড়া সত্য গেছন্ন হইয়া পড়ে। স্থায়ের ভাষায়, উহা কাবণ হইতে কার্যকরমান। উপস্থিত তর্কে উহা দাঁড় কবাইতেছে, যেহেতু আকর এক, সেহেতু সাড়ে পাঁচ শত বৎসর পূর্বে বঙ্গের পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ-প্রান্তের ভাষা এক ছিল। এবং যেহেতু “কৃষ্ণকীর্তনে” ঐক্য ছিল, সেহেতু “কৃষ্ণকীর্তনে” প্রাচীন। মনে করুন, “কৃষ্ণকীর্তনে”র বয়স ভুল ধরা হইয়াছে, তাহা হইলে তর্ক বোঝায় দাঁড় করায়? এই কাবণে বলি, একা প্রত্নলিপি-বেস্তার অনুমানে ভর না কবিয়া পুথীর যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নির্মম প্রথমে দৃষ্টিব গোচর করুন।

৩২। এখন মূল প্রশ্নে আসি। সতীশবাবু লিখিয়াছেন, কৃষ্ণকীর্তনে “একশ অनेक শব্দ পাওয়া যায়, যাহা সন্দেহ আসাম, উত্তরবঙ্গ বা পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য ভাষায় চলিত আছে।” ইহা হইতে অনুমান হয় কি যে, পুথিখানা সে সে প্রদেশ ঘুরিয়া আসিয়াছে? আদি বলি, না। কেবল-অমর দ্বারা অনুমান চরু, ও প্রায়ই অসিদ্ধ। তথাপি যদি অবশ্য-স্থলঅধিক এবং ব্যতিরেক অল্প হয়, তাহা হইলে অনুমান সম্ভাব্য বিবেচিত হইতে পারে। নিশ্চয় আসে না, সম্ভাব্যতামাত্র আসে। সে স্থল ব্যতিরেকগুলি বিচার করিতে হইবে। “কৃষ্ণকীর্তনে” এমন কোন শব্দ ও বিভক্তি আছে কি, যাহা উত্তরবঙ্গে আছে, পশ্চিমবঙ্গে নাই? এখানেও নিশ্চয়ে আসিতে পারি না। কাবণ, তর্ক উঠে, অধুনা পশ্চিমবঙ্গে নাই, পূর্বকালে ছিল। উপজীব্যেব অন্তরে এই তর্কের সমাধান হইতেছে না। কিন্তু সম্ভাব্যতা বিবেচিত হইল না। একথাও মনে রাখিতে হইবে, পূর্বকালের ইতিহাস সম্ভাব্যতা ব্যতীত নিশ্চয়ের ইতিহাস নহে। একটা নয় দুইটা নয়, বহু পথ যে দিক নির্দেশ কবে, সে দিকই গন্তব্য। সতীশবাবু বিভক্তি বিচার করেন নাই, কেবল ‘সে করিব’ এইরূপ একটা প্রয়োগ উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা পশ্চিমবঙ্গে তিন শত বৎসর পূর্ব প্রচলিত ছিল। তাহাঁই উদ্ধৃত শব্দের অধিকাংশ পশ্চিম-বঙ্গে আছে। তিনি যে অর্থ ধারিয়াছেন, সে অর্থ ঠিক, এবং সেই অর্থ পশ্চিমবঙ্গে চলিত আছে। কয়েকটা শব্দ পাঠিতেছি, পশ্চিমে চলিত নাই, পূর্বে আছে। যেমন, চি-ত-র, টে-ট-ন, কৈ-ল বা ক লি। এই তিনের মধ্যে চি-ত-বে মাত্র একটা পদে আছে। চি-ৎ বা চি-ত রাঢ়ে ও ওড়িয়ায় আছে। চি-ত-এ স্থানে চি-ত-রে এই পদ আসিতে পারে। স্তরায় এই শব্দ তেমন ব্যতিরেক নহে। স° ধ-ষ্ট স্থানে টী-ট। রূপান্তরে বৈষ্ণবপদাবলীতে টী-ট আছে। কিন্তু টে-ট-ন নাই। আসামোতে, এবং সতীশবাবু বলেন, পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষায় আছে। টে-ট-ন দুইটি পদে আছে। আশ্চর্য্য, দুইটি পদের ‘ঋ’ দেখিলে বুঝা যায়, দুই-ই অন্তর্গত। একটাও চণ্ডীমাসের যোগ্য মনে হয় না। দ্বিতীয় পদে (৯৬ পৃঃ) রাধিকার উপদেশ কাঁচা কবির কীর্তি। উষ্টব্য, ইহার না-ছি ক্রিয়াপদ আসামী আসামী ঠেকিতেছে। ক-লি, কৈ-লি, কৌ-ল, এই তিন একের তিন রূপ। ইহার একটাও ওড়িয়াতে নাই, রাঢ়ের ও আসামের ভাষায় নাই। সতীশবাবুর লেখায় আনিতেছি, পূর্ববঙ্গে গ্রাম্য ভাষায় আছে। যে

পদে (৮২ পৃঃ) ক-লি আছে, সে পরটি গ্রাম্য গালাগালি। কৃষ্ণ ‘ব্রিনশ-ঈশ্বর’ হইয়াও বাধা গোআলৌকে গদা দেখাইতেছেন, ‘পামী ছেনারি’ বলিতেছেন; আর বাধাও তেমনই, ‘বাপে মাএ’ গালি দিতে উত্তত হইয়াছেন। আব এক পদে (৩২৭ পৃঃ) ক-লি আছে। এ পদেরও কোনও গুণ নাই। যে পদে (৯২ পৃঃ) কৈ-লী, এবং যে পদে (১১১ পৃঃ) কৌ-ল, সে দুই পদও তথৈবচ। আশ্চর্য্যের বিষয়, একটা শব্দের দুই বিভিন্ন রূপ হইয়াছে, ক লি, কৈ-লি এবং কৌল।* এইরূপ, একই শব্দের যে দুই দুই রূপ আছে, তাহাতে বুঝি, পুথীর দুই স্থান দর্শন।

যদি বলেন, লিপিকর-প্রমাদে দুই রূপ হইয়াছে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসি, যে লিপিকর লেখার পর পুথী মিলাইয়াছিল, ভুল কাটিয়া লিখিয়াছিল, সে লিপিকর শব্দের দুই রূপ, বিভক্তির দুই রূপ কেমন কবিয়া রাখিল? ইহাতে বোধ হইতেছে, যুগ পুথিতেই দুই দুই রূপ ছিল।

দুই রূপের দুই কাণ্ড হইতে পারে। (১) একই দেশে কাণ্ডান্তব, (২) একই কালে দেশান্তব। তৃতীয় কল্পনাও আসে, কালান্তব ও দেশান্তব দুই-ই। কালান্তর স্বীকারে ‘খাঁটি চণ্ডীদাস’ থাকে না, দেশান্তর স্বীকারে ‘চণ্ডীদাসেব খাঁটি ভাষা’ থাকে না। আমাব সন্দেহ, দুই-ই হইয়াছিল। যিনি পূর্বপক্ষ কবিয়াছেন, তাহাঁকেই দেখাইতে হইবে, ভাষার ও ভাবে চণ্ডীদাস। আমি সংশয় জানাইয়া ক্ষান্ত। সংশয় দূর হইলে আমাব যে আনন্দ হইবে, তাহা অসংশয়ীষ কদাপি হইবে না। চুঃখেব বিষয়, আমার পড়া-শুনা নাই, অবসর নাই; “কৃষ্ণ-কীর্তন” লইয়া বাদ-প্রতিবাদের প্রয়োজনও নাই। ইতি

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়।

পুনশ্চ,

এই উত্তর লিখিবার পৰ আধি আমার “সংশয়” সত্যাবাবুর গোচর করিয়াছিলাম। তিনি কয়েকটি সংশয়ে সংশয় প্রকাশ কবিয়াছেন। বোধ হয়, এইখানে উল্লেখ করা ভাল।

সতীশ বাবুর বিবেচনায় আমি অতিরিক্ত সংশয়বাদী হইয়াছি। আমার বিবেচনায় আমার দেশী নামে অতিরিক্ত বিশ্বাসশীল হইয়া পড়ি। আমবা তুলিয়া যাই, যাহা সাধ্য, তাহাকে সাধন করিতে পারা যায় না, সংশয়িতকেও পারা যায় না। আমি এই কথা পুনঃ পুনঃ তুলিয়াছি। এখন সতীশ বাবুর কয়েকটা তর্ক দেখি।

(১) “প্রাকৃত” ও “তজ্জাত” শব্দাধিক্য। তিনি বলেন, “প্রাকৃত” ব্যাকরণের “প্রাকৃত” ৩৩ তজ্জাত অপভ্রংশ আমাদের দৃষ্ট অজ্ঞাত প্রাচীন পুথিতে যে পরিমাণে আছে, “কৃষ্ণকীর্তনে” তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী দেখা যায়, ইহা স্বাক্ষাৎ। সুতরাং এই সকল অজ্ঞাত প্রাচীন পুথি হইতে “কৃষ্ণকীর্তন” প্রাচীনতব, এইরূপ অসম্ভব কি অল্প অসঙ্গত?*

* সং সা ক-ল্য হইতে ‘মিলিত’, এই অর্থ আসে কি? বরং বা ‘কু-জ্ঞে দশ টাকা’ এরোগে কু-জ্ঞে বা কু-জ্ঞে সা-ক-ল্যে হইতে পারে। সা-ক-ল্য শব্দের বিকারে খ-উ-ল, ক-উ-ল, কো-ল, এবং পরে কৈ-ল, ক-লি বলে হয়। কু-জ-উ-ল—উ-ল, উ-ই-ল—উ-লি।

উত্তর। ‘পাখী সব করে বব রাতি পোছাইল’—এই পদের একটা শব্দও সংস্কৃত-সম মনে। অথচ জানি, পদটা আধুনিক। স্বীকার করি, “কৃষ্ণকীর্তনে” অধুনা-প্রচলিত কয়েকটা শব্দের প্রাচীন রূপ আছে। সে সব একত্র করিতে পারিলে যুক্তিব বলসম্পন্ন হইত। আমি জানিতে চাই, কোন্ কোন্ রূপ কোন্ সময়ে প্রচলিত ছিল, কোন্ সময়ে ছিল না। মনে রাখিবেন, “কৃষ্ণকীর্তন” কেবল ‘প্রাচীন’ নহে, সাড়ে পাঁচ শত বৎসরের প্রাচীন। সে সময়ের বাঙ্গালা ভাষার “প্রাকৃত” ও “তজ্জাত” শব্দ কি পরিমাণে চলিত ছিল, তাহা ভ জানি না। অন্ত দিকে দেখুন, বসন্তবাবু যে সকল পুস্তক হইতে “কৃষ্ণকীর্তনে” প্রযুক্ত শব্দ তুলিয়াছেন, বোধ হয়, সে সবের একখানাও তিন শত বৎসরের সে দিকের নয়। অতএব যে যে শব্দ প্রাচীন তৈকিত্রেছে, সে সবের প্রাচীনতার ম্যাদা এট। বিপত্তি ঘটাইয়াছে, নবীন বা আধুনিক রূপে। প্রত্নলিপিবিশেষ বিবেচনায় লিপির প্রাচীন রূপ দেখিয়া পুথীর বয়স গণিতে হইবে; আমার বিবেচনায় নবান রূপ দেখিয়া গণিতে হইবে।

২) অ আ বাননে। জানি অ হানে তা পাইয়া পৃথীর দেশভ্রমণ অনুমান কবিয়াছি। সতীশবাবু বলেন, “দেশবিশেষের বর্তমানের ব্যবহার দেখিয়া সাড়ে পাঁচ শত বৎসরের প্রাচীন ব্যবহার সম্বন্ধে অনুমান কি ঠিক? বীরভূম প্রভৃতি মিথিলার সন্নিহিত [?] দেশে ৫৬ শত বৎসর পূর্বে অ-কারের মৈথিল উচ্চারণের উচ্চারণ বর্তমান থাকা সম্ভব, এবং প্রাচীন কালে পুথির বানান সম্বন্ধে কোন ধবা-বাঁধা নিয়ম না থাকায় অনভিজ্ঞ লিপিকর কিংবা স্বয়ং চণ্ডীদাসও কোন স্থলে ‘ধনি’-অমুঘায়ী ও কোন স্থলে ‘সঙ্কেত’-অমুঘায়ী ‘অ’ ও ‘আ’ লিখিয়াছেন,—এরূপও ত কল্পনা করা যাইতে পারে।”

উত্তর। “কৃষ্ণকীর্তনে”র প্রাপ্ত পুথী যে সাড়ে পাঁচ শত বৎসরের, ইহা-ই সাধ্য। সাধ্যকে সাধন করিতে পাবা যায় না। সাধ্যকে ধারিয়া উৎপ্রেক্ষাও করিতে পারা যায় না। আমি স্বীকার করি, প্রাচীনের ইতিহাস সম্ভাবনার ইতিহাস, একশেষের ইতিহাস নহে। পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্বে বীরভূমে অ হানে আ উচ্চারণ ও লিখন অসম্ভব নয়। কিন্তু কোন্ দেশে প্রথমে দেখিব? যে দেশে আ-তি, আ-ধি-ক অত্যাঁপ আছে, না যে দেশে নাই?

(৩) অহুজ্জায় আনিআ-র (আন , কহিআ-র। কহ) ইত্যাদি র-যুক্ত ক্রিয়াপদ রাজবংশী ভাষায় আছে। সতীশবাবু লিখিয়াছেন, “বস্তুতঃ পূর্ববঙ্গের (ঢাকা - কলকাতা) জীজাতির গ্রাম্য কথাভাষায় এখনও কও এর, যাও-এর, থাও-এর ইত্যাদি অহুজ্জায় পদ সর্বদা শুনিতে পাওয়া যায়। বীরভূমেও যে প্রাচীন কালে সেরূপ ছিল না, কে বলিবে?”

উত্তর। এখানকার সাধ্যকে সিদ্ধ বিবেচনা করা হইয়াছে। যিনি বলিবেন ছিল, তাহাকে প্রমাণ দিতে হইবে।

৪) আমি বৈভক্তি দ্বিচর কারিয়া লিখিয়াছি, “সেটা কি ভাষা, যেটার কারক ও ক্রিয়ার ঠিকানা নাই।” সতীশ বাবু লিখিয়াছেন, “বাঙ্গালা হিন্দী মৈথিল—এই তিনটি ভাষায়ই একই ক্রিয়া ও কারকবিভক্তির একাধিক প্রয়োগ দেখা যায়।”

উত্তর। এক স্থানের এক বস্তাব মুখে একই অর্থে ক্রিয়া ও কারকবিভক্তি একই। সতীশ বাবু এক নতুন কথা তুলিয়াছেন। হয় ত তাহার অভিপ্রায় স্পষ্ট বুঝিতে পারি নাই। তিনি পবে লিখিয়াছেন, “বিজ্ঞাপতির পদে বর্তমানে ক ব, ক-ব ট, ক-র-ও, ক-র, ক-র-য়, ক-র-থি এইরূপ নানা রূপ দৃষ্ট হয়। সম্বন্ধে ক, ক-র, এমন কি, র পর্য্যন্ত দেখা যায়। এ সকল কি দেশান্তর ভ্রমণের ফল?” আমি বলি, অর্থ এক হইলে কেবল দেশান্তর নয়, কালান্তরের ফল। কারক ও ক্রিয়াতেই ভাষার সর্বস্ব।

(৫) শব্দের ও বিভক্তির হই হই রূপ দেখিয়া আমি মনে করিয়াছি, দেশান্তর, কালান্তর, কিংবা দেশকালান্তরের ফল। (আরও একটি ছিল, সেটি কব্যস্তর। কবি দেশ-কালের অধীন বলিয়া এই কোটি অগ্রাহ্য করিয়াছি।) সতীশ বাবু লিখিয়াছেন, “বলবস্তুর চতুর্থ কারণও আছে। সেটি এই যে একই কবির ভাষায় কালান্তরের একাধিক শব্দ ও বিভক্তির রূপের নিদর্শন—ভূগর্ভে নান্য যুগের প্রাণিসমূহের কঙ্কালবৎ বিস্তৃত থাকে।”

উত্তর। কথটা সত্য, যদিও দৃষ্টান্ত ঠিক হয় নাই। অতীত ধরিয়া বর্তমান, অতীত হইতে বর্তমান বিচ্ছিন্ন নহে। ইহা কেবল ভাষায় নয়, জগতের বাবতায় কাহে কোথাও স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট আছে। জগৎ অনাদি, জগতের কর্মও অনাদি। ভাষা যেমন নদীর তরঙ্গ। নদীর চড়া, বাক, গভীরতা, বিস্তার, মৃৎস্তর প্রভৃতির ভেদে তরঙ্গের উত্থান-পতন, গতি-বেগ, বর্ণ প্রভৃতির ভেদ হয়। দেশ-কাল-পাত্রভেদে ভাষারও ভেদ হয়। কিন্তু এই তিনের ভেদ না হইলে ভাষার সর্বস্ব যে কারক ও ক্রিয়া, তাহার ভেদ হয় না। বিজ্ঞাপতি, কি বৈক্যবপদাবলী, কি “ঐক্যকীর্তন” প্রভৃতি গ্রন্থে যদি ভেদ দেখি, তাহাতে অল্পমান করি, ভাষা খাটি নাই। বাজারে নির্জলা দুধ দুপ্রাপ্য, পুরাতন গানের নির্জলা ভাষাও দুপ্রাপ্য। কোন্ গান কত গায়ন গাইয়াছেন, কে জানে। আমি কোথাও বলি নাই, “ঐক্যকীর্তন” হই এক শত বৎসরের রচনা। অল্প কবি পাঁচ শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে থাকুন, কি পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্বে থাকুন, তাহা আমার বিচার্য ছিল না। প্রাপ্ত পুথিতে যে মিথাল চলিয়াছিল, ইহাই আমার সন্দেহ। তবে, মানব-মন নিরবচ্ছিন্ন সন্দেহে থাকিতে পারে না, কল্পনাদ্বারা সংশয়কে অসংশয়ে দাঁড় করায়। আমার মনে হয়, মূল পুথির উৎপত্তি রাঢ়ে। পরে গায়নে পুথী উত্তরবঙ্গে (গোড়ের ?) লইয়া গিয়াছিল। সেখানে কিছু কিছু রূপান্তরিত হইয়াছিল। ইহাতে মিথিলার জনশ্রুতি; পুথীতে কাইখী অক্ষর, কাসী অক্ষর (?)। পরে বিষ্ণুপুরে বৈষ্ণবধর্ম ও গীত প্রতিষ্ঠার পর রাজার পুথীশালায় প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু এই অল্পমান-স্বত্রে সব তথ্য গ্রহিত হইতে পারিল না। “ঐক্যকীর্তন” যদি চতুর্দশের, চতুর্দশের ভণিতায়ুক্ত প্রচলিত পদাবলী কুহার ? বৈষ্ণবাবু হই অভিন্ন মনে-কল্পিয়া অর্ধকুটো জ্ঞায় অল্পমোদন করিয়াছেন। রাবী রজকিনী ও সহজিয়া মত ও নাটকের চতুর্দশ সম্বন্ধে জনশ্রুতি, সব কি পোতহীন ভ্রুতি ? বাহুড়া-ছাতনার জনশ্রুতি আকাশে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া আছে ? আমার বিশ্বাস, বাহা ইতিহাস নামে খ্যাত, তাহার সমস্ত সত্য নহে ; এবং বাহা জনশ্রুতি নামে প্রচলিত, তাহারও সমস্ত অসত্য নহে।

পদাবলীর চণ্ডীদাস ও “কৃষ্ণকীর্তনে”ব চণ্ডীদাস এক ব্যক্তি বলিতে পারা যাইতেছে না। মনে করি, প্রাপ্ত পুথী অনন্তনামা গায়নের পুথী। তিনি নারায়ণের চণ্ডীদাসের ও অন্ত কবির (যেমন জয়দেবেব) পদ লইয়া নিজেব ও শ্রোতার রুচি অরুসায়ে অনেক পদ নিজের চিয়া গানেব পালা বাঁধিয়াছিলেন। হয় ত অনন্তও বাশলীৰ উপাসক ছিলেন। হয় ত বাঁকুড়ায় ইষ্টার নিবাস ছিল। যেমন এক কৃষ্ণবাসেব নামে বহু কবি তরিয়া যাইতেন, অনন্ত ও আরও অনেক কবি চণ্ডীদাসেব ভণিতাব মাহাত্ম্যো লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ কবিয়াছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত কৃষ্ণবাসী অযোধ্যাকাণ্ডে কৃষ্ণবাসের নামের সাহিত্য অন্ত এক কবির নাম যোজিত আছে। কবিকঙ্কণ চণ্ডাব “বঙ্গবাসী”ব সংস্করণ দেখুন। তাহাতে অন্ততঃ দুই কবির পদ আছে। ছাপা হয় নাই, এমন পদও শুনিয়াছি। অত কথায় কাজ কি, সে দিনকার গোবিন্দ অধিকাংশ ভাঙ্গা দলেব পালা বর্জ্যমানে শুনিয়াছি। প্রসিদ্ধ কবির বহু সম্প্রদায় ঘটে। বাস হইতে কালিদাস, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস-কৃষ্ণবাস-কবিকঙ্কণ হইতে রাম-প্রসাদ-গোবিন্দ-নীলকণ্ঠ অধিকাংশী এক এক সম্প্রদায়। নীলবহন বাবুর চণ্ডীদাস এইরূপ। এক হইতে সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। “কৃষ্ণকীর্তন” চণ্ডীদাসেব এক সম্প্রদায়েব গান নহে, চণ্ডীদাস-সম্প্রদায়ের গান। অষ্টাদশ পুৰাণ ব্যাসেব অষ্টাদশ সম্প্রদায়ের পুৰাণ নহে, ব্যাস-নামক সম্প্রদায়ের পুৰাণ। বলা বাহুল্য প্রবর্তকব নামে সম্প্রদায়ের নাম হয়। অতএব “কৃষ্ণকীর্তন” চণ্ডীদাসেব বলিতে পারি। ‘চণ্ডীদাসী’ বলা আরও ভাল।

সতীশবাবু তাহার পত্রে আব দুই বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন। দেখি, ‘চণ্ডীদাসীয়’ করনায় সে দুইয়ের সঙ্গতি হয় কি না। তিনি লিখিয়াছেন, (১) “নিত্যরূপ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের প্রকাশিত বহু-টীকা-সম্বলিত শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধেব ৩৩শ অধ্যায়ের ‘এবং শাস্ত্রাঙ্কুরবিরাটকতা নিশা’ ইত্যাদি ৬৩ সংখ্যক শ্লোকের শ্রীমৎসনাতন গোবিন্দকৃত বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী টীকার শেষ তিনি লিখিয়াছেন, “কাব্যাস্থানে পবনবৈচিত্র্য তাসাং স্মৃতিচাশ্চ গীতগোবিন্দাদি প্রাসঙ্গ্যঃ তথা শ্রীচণ্ডীদাসাদি দর্শিতদানখণ্ডনোকাখণ্ডাদি প্রকাবাশ্চ জ্ঞেয়াঃ”। সুতরাং চৈতন্যপ্রভুব সময়ে “কৃষ্ণকীর্তনে”ব অল্পরূপ দানখণ্ডাদি পদাবলী প্রচলিত ছিল।” বলা বাহুল্য, এই তথ্যেব সহিত আমার করনাব বিবোধ নাই। কিন্তু প্রাপ্ত পুথীতে যে দানখণ্ড ও নোকাখণ্ড আছে, তাহাই যে চৈতন্যপ্রভুব সময়ে প্রচলিত ছিল, এ কথা বলিবার হেতু নাই। (২) “চৈতন্যপ্রভুব সমসাময়িক সনাতন গোবিন্দাব বৃহৎ বৈষ্ণব তোষণী টীকায় ও রূপ-গোবিন্দীয় উজ্জলনীলমণি গ্রন্থে চন্দ্রাবলী অগ্রতম যুগ্মধরা ও প্রধান প্রতিনায়িকা। কৃষ্ণকীর্তনে চন্দ্রাবলী আরাধ্য নামান্তব। অতএব চণ্ডীদাস এই প্রতিনায়িকা চন্দ্রাবলীর অস্তিত্ব জানিতেন না। ইহা দ্বাবাও চণ্ডীদাসের এই পদগুলির (কৃষ্ণকীর্তনের) রূপ ও সনাতন গোবিন্দী হইতে প্রাচীনতা প্রমাণিত হয় না কি ?” আমি বলি, হয় না। বস্তু আমার করনায় সমর্থিত হইতেছে। কৃষ্ণকীর্তনেব কবি অনন্ত, চন্দ্রাবলীর নাম শুনিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীরাধা হইতে চন্দ্রাবলীর বিশেষ জানিতেন না। যে কবি কৃষ্ণ ও কন্দী অবতারের ক্রম জানিতেন না, সে কবির গানে, বোধ হয়, আবও ভুল পাওয়া যাইবে। ব্যাসীয় পুরাণে অনৈক্য আছে, চণ্ডীদাসীয় গানেও আছে। চণ্ডীদাসীয় পদাবলীর চন্দ্রাবলী উৎকৃষ্ট কবির সৃষ্টি। কৃষ্ণকীর্তনের কবি তাহার ধার দিয়াও যান না। তিনি যানের পালা জানিতেন না। অথচ হৃদ্যবন খণ্ডে এক ব্যর্থ ভাণ করিয়াছেন। ইতি—

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়।

এ দেশে ভূত্ববাদ*

গত বৎসরের পরিষৎপত্রিকার ৩এর সংখ্যায় আর্ঘভটের তত্ত্বের সহিত তাইরি ভূত্ব-বাদের ক্রিষ্ণ আলোচনা হইয়াছিল। যে মাসে এই সংখ্যা পাইবার কথা, সে মাসে আমি অসুস্থ ছিলাম। ইতিপূর্বে দেখি নাই, দৈবাৎ সে দিন দেখিলাম। এক সময়ে আশা করিয়াছিলাম, “আমাদের জ্যোতিষে”র দ্বিতীয় ভাগে ভূত্ববাদ ব্যাখ্যাসাধ্য বর্ণনা করিব। কিন্তু দেখিতেছি, সে আশা পূর্ণ হইবার নহে। নাই হউক, আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবাদিগের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে।

সকলেই জানেন, ভূত্ব বা পৃথিবীর ভ্রমণ আধুনিক মতে বিবিধ। (১) স্বীয় দেহের আবর্তন, (২) সূর্যকে প্রদক্ষিণ। (প্রদক্ষিণ—পূর্ব হইতে দক্ষিণ দিয়া পশ্চিমে গমন। ইহার কলে সূর্যকে পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে সরিতে দেখি।) আমরা সবাই শুনিয়াছি, আর্ঘভট পৃথিবীর স্বীয় অক্ষের ভ্রমণ স্বীকার ও প্রচার করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় গতি সম্বন্ধে আর্ঘভটের কি মত ছিল, তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না।

আমার বিশ্বাস, আর্ঘভট প্রথম গতির প্রচারক হইলেও স্থাপন্নতা ছিলেন না। প্রাচীন কালে এ দেশে বহু জ্যোতিষী সে গতি স্বীকার করিতেন। আত্মাষে বুঝা যায়, দ্বিতীয় গতিও স্বীকার করিতেন। কয়েকটি প্রমাণ সংক্ষেপে জানাইতেছি। বক্তব্যের সুবিধার নিমিত্ত দুই গতি পৃথক আলোচনা করি।

(১) পৃথিবীর স্বীয় অক্ষ আবর্তন

এ বিষয়ে আর্ঘভটের উক্তি, বিশেষতঃ উক্ত মতেব খণ্ডন প্রয়াস, যথেষ্ট প্রমাণ। আর্ঘভটের পর বরাহ, লল্ল, ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীপতি, যিনি পারিয়াছেন, তিনিই এক কলমে মতটা খণ্ডন করিতে বসিয়াছিলেন। পরে মতটা একবারে চাপা পড়িয়া যায়। ইহার কারণ কি, জানি না। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের কথা এই যে, আর্ঘভটের টীকাকার পবমাদীশ্বর পৃথিবীর আবর্তন “মিথ্যা জ্ঞান” বলিয়া আচার্যের বিপরীত মত প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন।

একটা কথা কিস্তি চিন্তা করিবার আছে। আর্ঘভট যখন তাইরি তত্ত্ব লেখেন, তখন তিনি রাজ্য তেইশ বৎসরের যুবা। অথচ, পৃথিবী অহোরাত্র লাটমের মতন ঘুরিতেছে, এত বড় প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ কথা নিজের কল্পনাবশে লিখিয়া ফেলিলেন! কেহ তাইকে নির্দোষ করিল না, কার্ণার ফেলিল না, প্রতি-শাস্ত বিরুদ্ধ বলিয়া পোড়াইয়া মারিল না? আরও আশ্চর্য, তত্ত্বশেষে তাইরি সন্দেহ। তিনি নির্ভয়ে লিখিলেন, যে আর্ঘভটের প্রতিকক্ষক বা শত্রু হইবে, তাহার পুণ্য ও আয়ুর বিনাশ হইবে, সে অধঃপাতে যাইবে! এই দর্পের কারণ নিশ্চয় ছিল। আত্মাষে বুঝি, দুই কারণ ছিল। (১) তিনি নূতন কিছু বলেন নাই, আদিকালে যৎ ব্রহ্ম

যে জ্যোতিঃশাস্ত্র বেদ হইতে উদ্ধার করিয়া নোকে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি সেই সংজ্ঞান সম্যক উদ্ধার করিয়াছিলেন মাত্র। অর্থাৎ দেশে এক ব্রহ্মসিদ্ধান্ত ছিল, যাহা অবলম্বন করিয়া তিনি আর্যভট্টীয় তন্ত্র লিখিয়াছিলেন। পূর্বের এক জ্যোতিষতন্ত্র আধার না পাইলে কেহ কোনও কিছু নূতন কবিত্তে পারেন না। ব্রহ্মগুপ্তও এক ব্রহ্মসিদ্ধান্ত ধরিয়া লিখিয়াছিলেন, অথচ “ব্রহ্মপরিব্রাজ্যে” আর্যভট্টের ভুল দেখাইয়া তাহাকে স্মৃতিবিরোধী ও অজ্ঞ প্রতীপাদন কবিত্তে ছাড়েন নাই। কেহ মিথ্যাকথা লিখিয়া গিয়াছেন, বলিতে পারি না। আর্যভট্টের কথা মিথ্যা হইলে ব্রহ্মগুপ্ত যুক্তিতে না গিয়া আরম্ভেই আর্যভট্টীয় অগ্রাহ্য কবিত্তেন, বোধ কবি, গালি দিতেও ছাড়িতেন না। পৃথিবী স্থির, আব বয়াদি-গ্রহসম্বলিত ভগ্নর গতিগণ, প্রত্যক্ষ হইতেছে। প্রত্যক্ষ থাকিতে কল্পনা (theory) নিস্প্রয়োজন। বিশেষতঃ কল্পনা মানিলে অশ্রু প্রত্যক্ষের অপলাপ হয়। বস্তুতঃ ব্রহ্মসিদ্ধান্ত একখানি ছিল না। এত কাল পরেও আমবা, ঢট তিনখানির সম্মান পাইয়াছি। “ব্রহ্মাব কৃত,”—ইহার তাৎপৰ্য চিন্তনীয়। সেটা এমন, যাহা আদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, যাহার আবস্ত কেহ জানে না বা জানিতে পারে না। (২) আর্যভট্ট লিখিয়াছেন, যে জ্ঞান কুমুমপুৰে—পাটলীপুত্র নগরে—অঘাতিত, পূজিত, সে জ্ঞান বলিতেছেন। ইহা হইতে বুঝি, সে কালে পাটনায় জ্যোতিষতন্ত্রের বিশেষ চর্চা ছিল, এবং গণকের এক সম্প্রদায় (school) ছিল। আর্যভট্ট সেই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। বোধ হয়, এই সম্প্রদায় পৃথিবীর আবর্তন-গতি স্বীকার কবিত্তেন। আর্যভট্ট স্বীয় গ্রন্থ সূত্রাকারে লিখিয়া গিয়াছেন, তথাপি সাধারণ প্রত্যক্ষের বিরোধী মত একটা নোকার দৃষ্টান্তে প্রণব কবিত্তে বসিলেন। ইহা অসম্ভব বোধ হয়। জানা কথার অবগমাত্র বধেই, অজানা কথা বলিতে বুঝাইতে শ্লোক বাড়াইতে হয়।

বিরোধী সম্প্রদায় “ভূ স্থিবা” ভাবিলেন বটে, কিন্তু কালের ধর্ম এড়াইতে পারিলেন না। তাহার। এমন একটা সংজ্ঞা ব্যবহার কবিত্তে লাগিলেন, যাহা চিরদিন “ভূ স্থিবা” বলিতে থাকিবে। এই সংজ্ঞা ‘কু-দিন’, অপর নাম ‘ভূ-দিবস’। ‘কু’, ‘ভূ’ একই অর্থ; কু-দিন পৃথিবীর দিন। জ্যোতিষে নানাবিধ দিন, মাস, বৎসর গণিত হয়। কিন্তু সকলের মূলে এক তত্ত্ব আছে। এক কথায় তাহার পরিবর্তে ‘গতিজ্ঞ’ ধরিলে চলে। যেমন, চাত্র-দিন—চাত্রের গতিজ্ঞ যে দিন; সৌর দিন—সূর্যের গমন হেতু যে দিন (রাশিচক্রের ১ অংশ অতিক্রম কাল); নাক্ষত্র দিন—নক্ষত্রের গতিজ্ঞ যে দিন; সাবন দিন—সূর্যের উদয়হেতু যে সবন আরম্ভ হইত, তাহা হইতে। এই রূপ, কু-দিন বা ভূ-দিবস—পৃথিবীর গতিজ্ঞ যে দিন, অর্থাৎ স্বীয় অক্ষে পৃথিবীর একবার আবর্তনের কাল। কবে এই সংজ্ঞার উৎপত্তি, কে জানে; কারণ, আর্যভট্টের আবির্ভাবের পূর্বের গ্রন্থ নামমাত্র আছে। আর্যভট্ট যে নূতন রচনা করিয়াছিলেন, এমনও বোধ হয় না। তিনি করিয়া থাকিলে তাহাঁর বিরোধী সম্প্রদায় সংজ্ঞাটি পরিত্যাগ কবিত্তেন। প্রকারান্তরে তাহাঁই কবিত্তেন। ‘কু-দিন’ আর কেবল পৃথিবীর দিন থাকিল না। ব্রহ্মগুপ্ত লিখিলেন, সাবন দিন বা, কুদিনও তা (সাবননির্ণয়ঃ কুদিনসান্তে)। কিন্তু ভাবিলেন না, যদি একই,

তবে এক পূর্বের সাবন দিন নাম থাকিবেই ত চলিত, একটা নতুন নাম কেন? আমার বোধ হয়, কুদিন সংজ্ঞা এত প্রচলিত ছিল যে, তাহা পবিত্যাগের পথ পাইলেন না। অর্থাৎ, করিয়া চালাইয়া দিলেন। ভাস্কবাচার্য ব্রহ্মগুপ্তের অনুগামী। তিনিও লিখিলেন, সূর্যসাবন দিন বা, 'মেদিনীদিনও' তা। অজ্ঞাত গ্রহেবও কুদিন কল্পিত হইল। এখন কুদিন বলিতে কেবল পৃথিবীর সাবন দিন বুঝায়। যেটা প্রকৃত কুদিন ছিল, সেটা 'নাক্ষত্র দিন' নামে উক্ত হইয়া থাকে।

একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, ব্রহ্মগুপ্ত আর্ঘভটের যত দোষই দেখুন, আর্ঘভটে যে জ্ঞান প্রকটিত আছে, তাহা একজনের দ্বারা ত নহেই, বহু জ্যোতিষীর বহু শতাব্দীর পরিশ্রম ও চিন্তা দ্বারা অর্জিত হইয়াছিল। এই হেতু মনে কবি, 'কুদিন' পরিভাষা আর্ঘভটের কল্পিত নহে। অর্থাৎ এমন এক কাল গিয়াছে, যখন এক সম্প্রদায় পৃথিবী অস্থিরা স্বীকার করিতেন। আর্ঘভটেই (খ্রীঃ ৫ম শতাব্দে) সে কালের অবসান হইয়াছিল। ত্রীপতির (খ্রীঃ ১১শ শতাব্দে) পর আর কাহাকেও ভূভ্রমবাদ ধণ্ডন করিতেও দেখি না।

আর একটা বড় কথা আছে, বাহাতে আর্ঘভটের মত বৃত্তিতে কিছুমাত্র সংশয় থাকে না। তিনি রবি-শশী প্রভৃতির যেমন ভ্রম-ভ্রমণ গণিয়াছেন, তেমন পৃথিবীরও গণিয়াছেন। নাম দিয়াছেন, কু-ভ্রমণ, অর্থাৎ পৃথিবীর ভ্রমণ-পূরণ। তাহার মতে এক সৌর বর্ষে পৃথিবী ৩৬০.২৫৮৬৮ বার ঘোরে। অর্থাৎ এক বর্ষে এত নাক্ষত্র দিন। এখানে একটা লক্ষ্য আছে। কুভ্রমণ অর্থে সূর্যের চারি দিকে নাক্ষত্র-চক্রে নহে, বীর অক্ষে ভ্রমণ।

(২) পৃথিবীর প্রাদক্ষিণ গতি

প্রাচীনরা এই গতি স্বীকার করিতেন কি না, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাই নাই। তবে, একটা বিষয় চিন্তার যোগ্য আছে। গ্রহগণের ভূ-কেন্দ্রিক গতি, আর রবি-কেন্দ্রিক গতি, এই দুই মতের কোনটার কল্পনা লাঘব হয়? দুই মতেই, চন্দ্র পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া ভ্রমণ কবিতেছে। সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া ভ্রমণ করিলে গণিতে যে ফল, পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া ভ্রমণ করিলে সেই ফল। অল্প পঞ্চতারাগ্রহ লইয়া দুই মতে প্রভেদ। ভূ-কেন্দ্রিক গতি মতে মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি, পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। ইহাও প্রত্যক্ষ হইতেছে। এই মতে বৃহস্পতির ভ্রমণ ভাল বৃত্তিতে পারা যায় না। এই দুই সূর্য হইতে বহু দূরে, সূর্য রাশির সপ্তম স্থানিতে কখনও যায় না। রবিকেন্দ্রিক গতি মতে গ্রহগতি বৃত্তিতে গেলে কল্পনার লাঘব হয় না, গৌরব হয়। পঞ্চতারাগ্রহ ও পৃথিবীকে ভীষণ বেগে সূর্যের চারিদিকে ঘোরাইতে হয়। অথচ পৃথিবী হইতে উহাদিগের গতি লক্ষ্য করিতে হয়। কেবল প্রত্যক্ষের বিরোধী নহে, কল্পনারও গৌরব স্বীকার করিতে হইতেছে। আমার বোধ হয়, এই কারণে প্রাচীনরা প্রত্যক্ষ লইয়া ভুল ছিলেন, পৃথিবীর রবিকেন্দ্রিক গতি কল্পনা করেন নাই। এক পরীক্ষা ছিল। সেটা, দূরত্ব সহিত গণিতের ঐক্যসাধন। যদি ঐক্য সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, নতুন

কল্পনার প্রয়োজন থাকে না। নতুন, যেটা প্রত্যক্ষের বিরোধী! তথাপি, গণিতের লাভবণ্ড চিন্তার বিষয়। পৃথিবী গির, ইচ্ছা প্রকাশ হইবেছে। গ্রহগুলি অস্ত্র। অস্ত্রকে রবিকেন্দ্রক করিলে যদি গণিতলাভ হয়, তাহা হইলে সে কল্পনার বাধা নাই। এইরূপ যুক্তি দ্বারা ইয়ুরোপে চাইকে এবং এ দেশে সে-দিনকার চন্দ্রশেখর পঞ্চভাষা-গ্রন্থের রবিকেন্দ্রক পতি স্বীকার করিয়া, রবিকেন্দ্র পৃথিবীর চারি দিকে ঘোরাইয়াছেন (সিদ্ধান্তদর্পণ, ৫ম প্রকাশে)। চন্দ্রশেখরকে এই নূন এমন র হেতু জিজ্ঞাসা কবিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, এই সকল গ্রহের পতি সূর্য-সম্বন্ধে কথ্য কবিলে বাস্তব মাঝে বসাইতে হয়, পৃথিবীকে নহে। কথাটা তাহার নিকট এত সোজা হইয়া গিয়াছিল যে, তিনি যে নূন কিছু বলিতেছেন, তাহা বোধ হয় নাই। তিনি আরও ব্যাখ্যাছিলেন, প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যাবিশেষের মত নিশ্চয় এইরূপ ছিল। দুঃখের বিষয়, তখন তাহাকে এই উক্তির প্রমাণ দেখাতে বলি নাই। বৃহৎ শুক্র তাহাঁদিগকে যে বিশেষ চিন্তিত কবিয়াছিল, তাহা অল্পেই বুঝিতে পারি।

চুআলিশ বৎসর পূর্বে কান্দী বাপুদেব শাস্ত্রী 'প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যাশাস্ত্রবর্ণনাম' নামে একখানি পুস্তিকা প্রচার কবিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি যুক্তি দ্বারা দেখাইয়াছেন, "ভৌমাদি পঞ্চগ্রহের রবিকেন্দ্রক ভ্রম" মূল-গ্রন্থকারদিগের অভিমত ছিল। নতুবা তাহাঁদিগের মতে পাতভগণপাঠ অমুচিত হইয়া পড়ে।" কিন্তু যদি পূর্বাচার্যদের ইংাই অভিপ্রায় ছিল, তাহা হইলে তাহাঁরা পৃথিবীর চারি দিকে গ্রহভ্রম প্রদর্শন করিলেন কেন? ইহার উত্তরে শাস্ত্রীজী লিখিয়াছিলেন, লোকের বিশ্বাস এবং অজ্ঞান্যাসে গোলাপতি ব্যাখ্যার নিমিত্ত সূর্যের ধর্মগুলি ধরণীতে আবোপ করিয়াছিলেন। তাহার যুক্তি অল্প কথায় সুবোধ্য হইবে না। বাহাঁরা গ্রহ-পণিত বুঝিয়াছেন, তাহাঁরা উক্ত পুস্তিকা পাঠ করিতে পারেন। (প্রাণিস্থান, মেডিকাল হল পেস, বেনারস)।

আমরা প্রাচীন কালের বহু গ্রন্থ পাঠ নাট। এ কারণ বহু স্থলে আমাদেরকে সত্যমিথ্যা করনা কারণে হইতেছে। টকাও পাই নাহ। আর্য-দের মাত্র দুইখানি টকা মুদ্রিত হইয়াছে, আবও কত টকা ছিল, কে জানে। কাবণ, তাহার ব্যাতিপ্রতিপত্তি অল্প ছিল না। অপর কথা কি, ব্রহ্মগুপ্তকে একটা অধ্যায় লিখিতে হইয়াছিল।

কয়েক বৎসর হইল, মালাবাব প্রদেশে লিখিত এক টকার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। টকাকারের নাম কেরলনালকঠ-সোমযাজী। টকা-প্রণয়ন-কাল প্রায় ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ। দক্ষিণের স্ত্রাহুপিলে মহাশয় মালয়লম ভাষায় আর্ঘভট সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। তাহার পুত্র রামলিঙ্গ পিলে, বি এ, তাহা ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছেন, এবং নটেশন কোম্পানীর "ইণ্ডিয়ান রিভিউ" নামিক পত্র প্রথমে প্রকাশ করিয়া, পরে পুস্তিকাকারে ছাপাইয়াছেন। এই বক্তৃতায় আর্ঘভট সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। ইংরেজীর অনুবাদ হইতে দুইটির উল্লেখ কনিতেছি। আর্ঘভটের 'শ্রীম্মোক্ষেনাপি'বৃহৎ-শুক্লো' (গোলপাদ), ইহার ব্যাখ্যায় টকাকার লিখিয়াছেন, 'পৃথিবী হইতে দেখিলে বৃহৎশুক্লকে এক একটি ছোট বৃত্ত করিতে দেখায়, হাদশ রাশি

ভ্রমণ করিতে দেখায় না। বাস্তবিক এই দুই গ্রহ বাকি কেন্দ্র কবিতা ভ্রমণ কবে।' পৃথিবীর প্রদক্ষিণ সম্বন্ধে নীলকণ্ঠ আর্থডটের 'ক্ষিতিক্ষা ভ্রমণ'। গোলপাদ, 'ইহাব ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, 'ভূ-পঙ্কজমধ্যে ক্ষিত অপক্রম-মণ্ডলে ভ্রমণ কবিত্তেছে, ক্ষিতিব গতি হেতু ছায়াব গতি।' এইরূপ, অল্প দুই এক স্থান হইতে টীকাকার স্পষ্ট লিখিয়াছেন, 'পৃথিবী অপক্রমমণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছে।' টীকাকারের উক্তিগুলি স্পষ্ট। ইয়ুরোপ হইতে শেখাও নহে। কাবণ, কোপারনিকসের কল্পনা খ্রীষ্টের ১৫শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে প্রচলিত হইয়াছিল, পূর্বে নহে। বঙ্গদেশে কেহ মনে কবিত্তাছেন, চন্দ্রশেখর ইয়ুরোপের জ্যোতিঃশাস্ত্র শুনিয়া তাইবা সিদ্ধান্ত-দর্পণে নূতন মত জুড়িয়া দিয়াছেন। তাইবা ভাবেন না যে, সে কথা সত্য হইলে তিনি কোপারনিকসের চলিত মত জুড়িয়া পুরাতন ও বিতাক্ত টাইকোর মত ধরিলেন কেন? তিনি 'ভূ স্থিরা' লিখিয়া গিয়াছেন; বহু বাদান্তবাদও 'ভূ অস্থিরা' বলাইতে পারি নাট। কারণ, প্রত্যক্ষের বিরোধী।

পিলে মহাশয় আর এক কথার উল্লেখ করিয়াছেন। ববাহ বৃহৎসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে জ্যোতিষীর লক্ষণ বর্ণন করিয়াছেন। যিনি জ্যোতিষী নামে গণ্য হইতে চান, তিনি এই এই বিষয় সম্যক জানিবেন। এইরূপ বলিতে ববাহ লিখিতেছেন, গণকের জানা চাই, 'ভূ-ভগণ ভ্রমণ-সংস্থানাদি'। ইহার সোজা অর্থ, পৃথিবীর ভগণ বা প্রদক্ষিণ, পৃথিবীর ভ্রমণ বা আবর্তন, এবং পৃথিবীর সংস্থান প্রভৃতি। সংস্কৃত ব্যাকরণে বোধ হয়, এই অর্থ অসুন্দরিত হইবে। বৃহৎসংহিতার প্রসিদ্ধ টীকাকার উৎপলভট্ট কিন্তু অর্থ কবিত্তাছেন, ভূমে: সংস্থানং তথা চ ভগণস্ত নক্ষত্রচক্রস্ত ভ্রমণসংস্থানং চ জানাতি। অবশ্য উৎপল ববাহের পক্ষসিদ্ধান্তিকা হইতে পোষক প্রমাণ তুলিয়াছেন। কিন্তু সেটা সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া স্পষ্ট বোধ হয়। অধিক ধরিলে ভূমির ও ভগণের ভ্রমণসংস্থানাদি পর্যন্ত যাইতে পারা যায়, কিন্তু ভূমির সংস্থান ও ভগণের ভ্রমণ ও সংস্থান জানিতে পারা যায় না। ববাহের কি অভিপ্রায় ছিল, কে জানে। হয় ত সে কালের মতের স্রোতে পাড়িয়া বাস্তবিক ভূ-ভ্রমণ গিথিয়া-ছিলেন, টীকাকার (খ্রীঃ ১০ম শতাব্দী) তেমনই ভিন্ন স্রোতে পড়িয়া অল্প অর্থ করিয়াছেন।

এই সকল প্রমাণ হইতে অনুমান হয়, (১) এ দেশে প্রাচীন কালে এক জ্যোতিষিক সম্ভ্রমণ পৃথিবীর স্বীয় অক্ষে আবর্তন স্বীকার করিতেন; (২) পৃথিবীর প্রদক্ষিণ অল্প জনে স্বীকার করিতেন; (৩) পঞ্চতারি গ্রহের পক্ষে রবি প্রদক্ষিণ অধিক জনে কবিতেন; (৪) এবং বৃহত্ত্বকের সকলেই করিতেন। *এ কথাও স্মরণ কর্তব্য, এই যে স্বীকার, তাহা কল্পনা মাত্র, দৃক-গণিতাগত। ইয়ুরোপেও অতাপি কল্পনা মাত্র; বিশেষ এই, কল্পনাব পক্ষে দৃক-গণিতের প্রমাণাবিক্য ঘটয়াছে।

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়।

পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণ ও ভাগ

পাটীগণিতে পূর্ণসংখ্যা, ভগ্নাংশ, দশমিক ও পৌনঃপুনিক দশমিক, এই চারি প্রকারের রাশি দৃষ্ট হয় এবং পূর্ণসংখ্যা, ভগ্নাংশ ও দশমিক রাশির যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ পৃথক পৃথক বিশিষ্ট নিয়মে সাধিত হয়। কিন্তু পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির যোগ বিয়োগ ভিন্ন, গুণ কি ভাগ কবিত্রে হইলে পৌনঃপুনিক দশমিক রাশিকে অগ্রে ভগ্নাংশে পরিবর্তিত করিয়া, উক্ত কার্য সম্পাদনপূর্বক পুনর্বার ভাগের দ্বারা পৌনঃপুনিক দশমিক রাশিতে পরিণত করিতে হয়।

অন্ত-বাশি-নিরপেক্ষ কোন একটা পৃথক নিয়ম দ্বারা পৌনঃপুনিক-দশমিক রাশির উক্ত কার্যসকল সাধিত না হইলে পাটীগণিতের পৌনঃপুনিক-দশমিক অধ্যায় অসম্পূর্ণ থাকে। যাহাতে কোন বিশিষ্ট নিয়ম দ্বারা পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণ ও ভাগ সাধিত হইতে পারে, সেই জন্তই এই চেষ্টা।

পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণন

বিশুদ্ধ ও মিশ্রভেদে পৌনঃপুনিক দশমিক বাশি দুই প্রকার। বিশুদ্ধ যথা— 0.3 , 0.2 , মিশ্র যথা— 2.086 ; 0.97 ।

(ক) বিশুদ্ধ পৌনঃপুনিক দশমিক রাশিকে বিশুদ্ধ পৌনঃপুনিক দশমিক রাশি দিয়া গুণ করাব নাম—বিশুদ্ধ পৌনঃপুনিক দশমিকের গুণন। যথা 525×3 , 282×308 ।

(গ) মিশ্র পৌনঃপুনিক দশমিক রাশিকে মিশ্র বা বিশুদ্ধ পৌনঃপুনিক দশমিক রাশি দিয়া গুণ করার নাম মিশ্র পৌনঃপুনিক দশমিক বাশির গুণন। যথা, 0.36×0.8 । 0.285×0.9 ।

পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণনের সাধারণ নিয়ম

$$\begin{aligned} \text{‘অ’} &= \text{‘অ অ অ অ....’} \\ &= \frac{\text{অ}}{10} + \frac{\text{অ}}{10^2} + \frac{\text{অ}}{10^3} + \frac{\text{অ}}{10^4} + \dots \end{aligned}$$

$$= \text{অ} \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{10^2} + \frac{1}{10^3} + \frac{1}{10^4} + \dots \right)$$

ঠিক—এইরূপে,

$$\text{‘অ ই’} = \text{অ ই} \left(\frac{1}{10^2} + \frac{1}{10^3} + \frac{1}{10^4} + \frac{1}{10^5} + \dots \right)$$

$$\text{‘অ ই ট’} = \text{অ ই ট} \left(\frac{1}{10^3} + \frac{1}{10^4} + \frac{1}{10^5} + \frac{1}{10^6} + \dots \right)$$

(প্রত্যেক স্থলেই গুণ্য ও গুণক সমসংখ্যক পৌনঃপুনিক অঙ্কবিশিষ্ট করিয়া, লইতে হইবে।*)

এখন,

$$(1) \text{ ‘অ’} \times \text{‘ই’} = \text{অ} \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{10^2} + \frac{1}{10^3} + \dots \right) \times \text{ই} \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{10^2} + \frac{1}{10^3} + \dots \right)$$

$$= \text{অ ই} \left(\frac{1}{10^2} + \frac{2}{10^3} + \frac{3}{10^4} + \frac{4}{10^5} + \dots \right)$$

$$= \text{অ ই} (01 + 002 + 0003 + 00004 + \dots)$$

$$= \text{অ ই} (0120869201208692012 \dots)$$

$$= \text{অ ই} (01208692) \dots \dots \dots \text{১ম প্রণালী।}$$

$$(2) \text{ ‘অ ই ট’} \times \text{‘ক খ’} = \text{অ ই} \left(\frac{1}{10^3} + \frac{1}{10^4} + \frac{1}{10^5} + \dots \right) \times \text{ক খ} \left(\frac{1}{10^2} + \frac{1}{10^3} + \frac{1}{10^4} + \dots \right)$$

$$= \text{অ ই ক খ} \left(\frac{1}{10^5} + \frac{2}{10^6} + \frac{3}{10^7} + \frac{4}{10^8} + \dots \right)$$

$$= \text{অ ই ক খ} (0001 + 00002 + 000003 + 0000004 + \dots)$$

$$= \text{অ ই ক খ} (00010102030405 \dots \dots \dots ২য় প্রণালী।)$$

* সমসংখ্যক পৌনঃপুনিক = ল, সা, গুর দ্বারা কেবলমাত্র পৌনঃপুনিক অঙ্কের সংখ্যা সমান করণ।

উপলোক্ত প্রণালী হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, গুণ্য ও গুণককে সমসংখ্যক পৌনঃপুনিক পরিবর্তিত করিয়া, মিশ্র পৌনঃপুনিক রাশির তদবস্থ (Non recurring) ও পৌনঃপুনিক অংশদ্বয়কে পৃথক পৃথক ভাবে নূতন গুণক দিয়া গুণ করিতে হইবে এবং তদবস্থ অংশের গুণফলে দশমিক দ্বন্দ্ব বসাইতে হইবে। পরে উক্ত তদবস্থ অংশের গুণফলের নীচে ডান দিকে, পৌনঃপুনিক অংশের গুণফলকে ১, ২, ৩, ৪ বা আবশ্যকমত সংখ্যা দ্বাৰা যথাক্রমে গুণ করিয়া, প্রত্যেক বারের গুণফলের সহিত তদবস্থ অংশের গুণফল যোগ করিয়া, গুণকের অঙ্কসংখ্যার সমসংখ্যক স্থান হইতে লিখিতে হইবে। অবশেষে যোগফলের নিদিষ্ট স্থানে পৌনঃপুনিক বসাইতে হইবে।

যথা, (১) ০৬×৪ ইহাদের পৌনঃপুনিক সংখ্যা সমসংখ্যক বিশিষ্ট এবং পৌনঃপুনিক অংশদ্বয় ৬×৪ । ইহাদের গুণফলে ৩ উৎপাদক রহিয়াছে; হতরং $৯ \div ৩ = ৩$ টী পৌনঃপুনিক গুণফলে থাকিবে।

$০৬ \dots\dots\dots ৮$ তদবস্থ অংশ এবং ৬ পৌনঃপুনিক অংশ।

০৬ [দশমিক বিন্দুযুক্ত তদবস্থ অংশের গুণফল] $\frac{৬}{২৪}$ [পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল]

০২ তদবস্থ অংশের গুণফল
 ০৬ পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল $\times ১ +$ তদবস্থ অংশের গুণফল।
 ৮০ পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল $\times ২ +$ তদবস্থ অংশের গুণফল।
 ৯০৪ পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল $\times ৩ +$ তদবস্থ অংশের গুণফল।
 ১২৮ পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল $\times ৪ +$ তদবস্থ অংশের গুণফল।
 ১৫২ পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল $\times ৫ +$ তদবস্থ অংশের গুণফল।
 ০৮৫১৮৩২
 $= ০৮৫১$

(২) ০৮৫১৮৩২×১৮ $০৮৫১৮৩২ \times ১৮১৮১৮ \dots$ সমসংখ্যক পৌনঃপুনিক হইল,
 $[৮৫১৮৩২ = ২ \times ২ \times ১১ \times ৯৬২, ১৮১৮১৮ = ২ \times ২ \times ১১ \times ১০১০১, ৯৯৯৯৯৯ = ৩ \times ১১ \times ১০১০১]$
 $\therefore \frac{২ \times ১১ \times ১ - ১০১}{২ \times ১১ \times ১০১০১} \times ৬ = ৩$ টী পৌনঃপুনিক গুণফলে থাকিবে।

১৮১৮১৮
 $১২৭২৭২৬ \dots\dots$ তদবস্থ অংশের গুণফল।
 ৮৫১৮৩২
 ১৮১৮১৮
 ৬৮৫১৮৩৬
 ৮৫১৮৩২
 ৩৮৫১৮৩৬
 ৮৫১৮৩২
 ৬৮৫১৮৩৬
 ৮৫১৮৩২
 $১৫৫৮৭৩৮৩৪৬৬\dots\dots$ পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল।

$১২৭২৭২৬ \dots\dots\dots$ তদবস্থ অংশের গুণফল।
 $১৫৫৮৫১১৬৮৮২\dots$ পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল $\times ১ +$ তদবস্থ অংশের গুণফল।
 ৩১১৬৮৮২৬১০৬৮ পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল $\times ২ +$ তদবস্থ অংশের গুণফল।
 ১৫২৮৫১১৮২৮৫১০৬১০৬৮
 $= ১৫২৮৫১$

(২) মিশ্র $\times$ মিশ্র পৌনঃপুনিক দশমিক রাশি

• ক অং প হ

• ক অং = ক অ অ অ অ $\dots\dots\dots = \frac{ক}{১০} + \frac{অ}{১০^২} + \frac{অ}{১০^৩} + \frac{অ}{১০^৪} + \dots\dots\dots$

প হং = প হ হ হ হ $\dots\dots\dots = \frac{প}{১০} + \frac{হ}{১০^২} + \frac{হ}{১০^৩} + \frac{হ}{১০^৪} + \dots\dots\dots$

ক অং $\times$ প হং = $\left(\frac{ক}{১০} + \frac{অ}{১০^২} + \frac{অ}{১০^৩} + \frac{অ}{১০^৪} + \dots\dots\dots \right) \times \left(\frac{প}{১০} + \frac{হ}{১০^২} + \frac{হ}{১০^৩} + \frac{হ}{১০^৪} + \dots\dots\dots \right)$
 $= \frac{কপ}{১০^২} + \frac{পঅ + কহ}{১০^৩} + \frac{(পঅ + কহ) + অহ}{১০^৪} + \frac{(পঅ + কহ) + ২ অহ}{১০^৫} + \dots\dots\dots$

উক্ত নিয়মটি হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম, গুণা ও গুণকে সমসংখ্যক পোনঃপুনিকে পরিণত করিয়া, প্রথমতঃ গুণকের তদবস্থ অংশ দ্বারা গুণ্যের তদবস্থ অংশকে গুণ করিয়া, তাহাতে দশমিক বিন্দু স্থাপন কর। দ্বিতীয়তঃ গুণ্যের তদবস্থ অংশকে গুণকের পোনঃপুনিক অংশ দ্বারা এবং গুণ্যের পোনঃপুনিক অংশকে গুণকের তদবস্থ অংশ দ্বারা, পৃথক পৃথক ভাবে গুণ করিয়া একত্রে যোগ দাও। তৃতীয়তঃ গুণ্যের পোনঃপুনিক অংশকে গুণকের পোনঃপুনিক অংশ দ্বারা গুণ কর। এখন তদবস্থ অংশের গুণফলের নিয়ে ডান দিকে, গুণকের পোনঃপুনিক সংখ্যার সমসংখ্যক স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় গুণফলসমষ্টি লিখ এবং উহা য় নিয়ে ডান দিকে, গুণকের পোনঃপুনিক সংখ্যার সমসংখ্যক স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া তৃতীয় গুণফলকে ১, ২, ৩ বা আবশ্যক-মত সংখ্যা দিয়া যথাক্রমে গুণ ও তাহার সহিত প্রত্যেক বার দ্বিতীয় গুণফলসমষ্টি যোগ দিয়া লিখিয়া যাও। অবশেষে যোগফলে নির্দিষ্ট স্থানে পোনঃপুনিক বিন্দু বসাদ।

যথা—

$$^{\circ}৩২৪৫ \times ^{\circ}৩৫$$

$^{\circ}৩২৪৫$, $^{\circ}৩৫৫$ সমসংখ্যক পোনঃপুনিক হইল।

$$\left. \begin{array}{l} ৪৫ \times ৫৫ = ৫ \times ৫ \times ৯ \times ১১ \\ ৯৯ = ৯ \times ১১ \end{array} \right\} \text{হুঁতরাং গুণফলে } ৯৯ \times ২ = ১৯৮ \text{টী পোনঃপুনিক থাকিবে}$$

প্রথমতঃ	৩২	দ্বিতীয়তঃ	৩২	৪৫	১৭৬৭	তৃতীয়তঃ	৫৫
	৩		৫৫	৩	১৩৫		৫৫
০৯৬			১৬০	১৩৫	১৮৯৫		২৩৫
			১৬০				২২০
			১৭৬০				২৪৭৫

= গুণফলসমষ্টি।

$^{\circ}০৯৬$ তদবস্থ অংশদ্বয়ের গুণফল।

$^{\circ}১৮৯৫$ দ্বিতীয় গুণফলসমষ্টি।

৪৩ ০... .. পোনঃপুনিক অংশদ্বয়ের গুণফল $\times ১$ + দ্বিতীয় গুণফলসমষ্টি।

৬৮৪৫... .. পোনঃপুনিক অংশদ্বয়ের গুণফল $\times ২$ + দ্বিতীয় গুণফলসমষ্টি।

৯৩২০... .. পোনঃপুনিক অংশদ্বয়ের গুণফল $\times ৩$ + দ্বিতীয় গুণফলসমষ্টি।

$$^{\circ}১১৫৩৯৩৯৩৮২০$$

= ১১৫৬৯ উত্তর।

গুণনের পরিমিত

(ক)

সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা

ক্রমিক সংখ্যা	গুণ্য (Series)	গুণ্যের সংখ্যা	গুণক	গুণক		
				গুণক	গুণ্যের সংখ্যা	গুণের ফলাফল
১	১১২৩৪৫৬	$2 \times 1 = 2$	$2 = 2 \times 1$	১ 2×1	$2 \times 1 = 2$ $2 \times 2 = 4$	$2 - 1 = 1$...
২	১০ ০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ ০৯	$2 \times 2 = 4$	$22 = 2 \times 11$	১ 2×2 ১১	$22 \div 2 \times 2 = 11$ $22 \div 2 \times 2 = 11$ $22 \div 11 \times 2 = 11$	$22 \div 2 - 1 = 10$ $22 \div 2 - 1 = 10$ $22 \div 11 - 1 = 10$
৩	০০০ ০০১ ০০২ ... ০৯৯ ১০০ ১০১	$22 \times 2 = 44$	$222 = 2 \times 11 \times 11$	১ 2×2 ১১ 2×11	$222 \div 2 \times 11 = 101$ $222 \div 2 \times 11 = 101$ $222 \div 11 \times 11 = 18$ $222 \div 11 \times 11 = 18$	$222 \div 2 - 1 = 110$ $222 \div 2 - 1 = 110$ $22 \div 11 - 1 = 10$ $22 \div 11 - 1 = 10$
৪	০০০০ ০০০১ ০০০২ ... ৯৯৯৯ ১০০০০ ১০০০১	$222 \times 2 = 444$	$2222 = 2 \times 11 \times 11 \times 11$	১ $2 \times 2 \times 11$ 11×11 ১০১	$2222 \div 2 \times 11 = 10101$ $2222 \div 2 \times 11 = 10101$ $2222 \div 11 \times 11 = 1818$ $2222 \div 11 \times 11 = 1818$	$2222 \div 2 - 1 = 11109$ $2222 \div 2 - 1 = 11109$ $222 \div 11 - 1 = 19$ $222 \div 11 - 1 = 19$
৫	০০০০০ ০০০০১ ... ৯৯৯৯৯ ১০০০০০ ১০০০০১	$2222 \times 2 = 4444$	$22222 = 2 \times 11 \times 11 \times 11 \times 11$	2×11 2×11 2×11 11×11	$22222 \div 2 \times 11 = 1010101$ $22222 \div 2 \times 11 = 1010101$ $22222 \div 11 \times 11 = 181818$ $22222 \div 11 \times 11 = 181818$	$22222 \div 2 - 1 = 111109$ $22222 \div 2 - 1 = 111109$ $2222 \div 11 - 1 = 199$ $2222 \div 11 - 1 = 199$
৬	০০০০০০ ০০০০০১ ... ৯৯৯৯৯৯ ১০০০০০০ ১০০০০০১	$22222 \times 2 = 44444$	$222222 = 2 \times 11 \times 11 \times 11 \times 11 \times 11$	$2 \times 2 \times 11$ $2 \times 2 \times 11$ $11 \times 11 \times 11$ $2 \times 11 \times 11$	$222222 \div 2 \times 11 = 101010101$ $222222 \div 2 \times 11 = 101010101$ $222222 \div 11 \times 11 \times 11 = 18181818$ $222222 \div 11 \times 11 \times 11 = 18181818$	$222222 \div 2 - 1 = 1111109$ $222222 \div 2 - 1 = 1111109$ $22222 \div 11 - 1 = 1999$ $22222 \div 11 - 1 = 1999$
৭	০০০০০০০ ০০০০০০১ ... ৯৯৯৯৯৯৯ ১০০০০০০০ ১০০০০০০১	$222222 \times 2 = 444444$	$2222222 = 2 \times 11 \times 11 \times 11 \times 11 \times 11 \times 11$	$2 \times 2 \times 2 \times 11$ $2 \times 2 \times 2 \times 11$ $11 \times 11 \times 11 \times 11$ $2 \times 11 \times 11 \times 11$	$2222222 \div 2 \times 11 = 10101010101$ $2222222 \div 2 \times 11 = 10101010101$ $2222222 \div 11 \times 11 \times 11 \times 11 = 1818181818$ $2222222 \div 11 \times 11 \times 11 \times 11 = 1818181818$	$2222222 \div 2 - 1 = 11111109$ $2222222 \div 2 - 1 = 11111109$ $222222 \div 11 - 1 = 19999$ $222222 \div 11 - 1 = 19999$
৮	০০০০০০০০ ০০০০০০০১ ... ৯৯৯৯৯৯৯৯ ১০০০০০০০০ ১০০০০০০০১	$2222222 \times 2 = 4444444$	$22222222 = 2 \times 11 \times 11 \times 11 \times 11 \times 11 \times 11 \times 11$	$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 11$ $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 11$ $11 \times 11 \times 11 \times 11 \times 11$ $2 \times 11 \times 11 \times 11 \times 11$	$22222222 \div 2 \times 11 = 1010101010101$ $22222222 \div 2 \times 11 = 1010101010101$ $22222222 \div 11 \times 11 \times 11 \times 11 \times 11 = 181818181818$ $22222222 \div 11 \times 11 \times 11 \times 11 \times 11 = 181818181818$	$22222222 \div 2 - 1 = 111111109$ $22222222 \div 2 - 1 = 111111109$ $2222222 \div 11 - 1 = 199999$ $2222222 \div 11 - 1 = 199999$
৯	০০০০০০০০০ ০০০০০০০০১ ... ৯৯৯৯৯৯৯৯৯ ১০০০০০০০০০ ১০০০০০০০০১	$22222222 \times 2 = 44444444$	$222222222 = 2 \times 11 \times 11 \times 11 \times 11 \times 11 \times 11 \times 11 \times 11$	$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 11$ $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 11$ $11 \times 11 \times 11 \times 11 \times 11 \times 11$ $2 \times 11 \times 11 \times 11 \times 11 \times 11$	$222222222 \div 2 \times 11 = 101010101010101$ $222222222 \div 2 \times 11 = 101010101010101$ $222222222 \div 11 \times 11 \times 11 \times 11 \times 11 \times 11 = 18181818181818$ $222222222 \div 11 \times 11 \times 11 \times 11 \times 11 \times 11 = 18181818181818$	$222222222 \div 2 - 1 = 1111111109$ $222222222 \div 2 - 1 = 1111111109$ $22222222 \div 11 - 1 = 1999999$ $22222222 \div 11 - 1 = 1999999$

(২) ৪৯৩×২৯৯৪৪

$$\begin{array}{r} ৪৯৩ \times ২৯৯৪৪ \\ ২৯৯৪৪ \\ ৪৯৩০০ \\ ৯৮৬৮৮ \\ \hline ১৪৭০৬ \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ৪৯৩ \times ২৯৯৪৪ \\ ১০০৯৪৪ \\ ১০৯৩০০ \\ ২৯৮৬৮৮ \\ ৪৯৩০০০ \\ \hline ৪৯৩০০০ \end{array}$$

$$১৪৭০৬৬৬$$

$$৪৯৩০০০$$

$$৪৯৩$$

$$১৪৭৭৭৭৭ = ১৪৭ উত্তর।$$

পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির ভাগ

ভাগ ও ভাজকে সমসংখ্যক পৌনঃপুনিক দশমিকে পরিবর্তিত করিয়া উভয়ের তদনুসং অংশ বাদ দাও। এই নূতন ভাগ ও ভাজকক অমিশ্র রাশি ধরিয়া ভাগ করিতে ক.বা.স সম্বন্ধে দশমিক ও পৌনঃপুনিক নিম্ন বসিও।

(১) $৪২৬ \div ২৪$
 $\left. \begin{array}{l} ৪২৬৬ \\ ২৪২ \end{array} \right\}$ সমসংখ্যক পৌনঃপুনিক দশমিক হইল।

 $\left. \begin{array}{l} ৪২৬৬ - ৪২ = ৪২২৪ \\ ২৪২ - ২ = ২৪০ \end{array} \right\}$ তদনুসং অংশ বাদ দিয়া নূতন ভাগ ও ভাজক গঠিত হইল।

২৪০) ৪২২৪ (১৭৬ উত্তর

$$\begin{array}{r} ২৪০ \\ ১৬২৪ \\ \hline ১৬৮০ \\ \hline ১৪৪০ \\ \hline ১৪৪০ \end{array}$$

$$\begin{array}{l} ৪২৬৬ - ২ = ৪২৬৪ - ৪ = ৪২৬০ \\ = ৪২৬০ - ২৪ = ৪২৩৬ \end{array}$$

২৪) ৪২৩৬ (১৭৬ উত্তর

$$\begin{array}{r} ২৪ \\ ১১১ \\ ৬৬ \\ ১২০ \\ ২৪ \\ ২৪০ \\ ১৬৮ \\ \hline ১২০ \end{array}$$

পরিণামে গণিতজ্ঞগণের নিকট নিবেদন, সিদ্ধান্তগুলি আলাচনার ও পরীক্ষার ভার তাঁহাদেরই। সত্য আলাচনাতেই আবিস্কৃত হয়, ইহাই সনাতন নীতি।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোন্ডার

বর্ধমান উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

“পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণ ও ভাগ” প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য

ঐযুক্ত নরেন্দ্রনাথ কোন্ডার মহাশয় যে প্রণালীটি তাঁহার প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন, গণিতজ্ঞ পাঠকসমাজেই দেখিবেন যে, সেটা বেশ সরল ও সহজ। কিন্তু যত লুপ্ত আমি জানি, কোন পাঠ্যপুস্তকে এই প্রণালীতে পৌনঃপুনিক রাশির গুণ ও ভাগ দেখিত পাই নাই। অথচ প্রণালীটি এত সরল (বিশেষতঃ ভাগের প্রণালী) যে, এরকম ভাবে কোন যে করা হয় নাই, তাহিলে একটা অশ্চর্য্য হইতে হয়।

তা ছাড়া আর এক দিক হইতে প্রণালীটির শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধ হয়। পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণ ও ভাগ করিতে হইলে সচরাচর তাহাকে লুপ্তাংশে পরিণত করিয়া, তৎপরে গুণ ও ভাগ সমাধা করিয়া, পুনরায় তাহাকে দশমিকে পরিণত করা হয়। কিন্তু বস্তুতঃ এক প্রকার রাশির উপরে কোন অপেক্ষা (operation) সাধন করিবার

সন ১০২৬] গৌনঃপুণিক দশমিক রাশির গুণ ও ভাগ প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য ৬১

অন্ত অন্তর্বিধ রাশির সাহায্য গ্রহণ করা অসম্ভবতাই পরিচায়ক—তাহাতে প্রথমোক্ত রাশি সৰ্বকে অসম্পূর্ণতা আদিয়া পড়ে। এই অসম্পূর্ণতা (incompleteness) বর্তমান প্রণালী দ্বারা দূরীভূত হয়। এই কারণে বিত্তম পণিত ও ভাষ্যের (logic) দিক দিরা দেখিতে গেলে, এই প্রণালীটিকে প্রচলিত প্রণালী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বলিয়া মনে হয়।

Logical incompleteness বাতীত প্রচলিত প্রণালীতে আরও একটা গুরুতর দোষ আছে। সেটা এই,— দুইটা গৌনঃপুণিক দশমিক রাশি দেওয়া রহিয়াছে; তাহাদের গুণ অথবা ভাগ করিলে, গুণকল বা ভাগকল কি একালের গৌনঃপুণিক রাশি হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা আগে হইতে কিছুই বলা যায় না—করটি digit লইয়া গৌনঃপুণিক চিহ্ন পড়িবে অর্থাৎ recurrence-period কত হইবে, তাহা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। ষোট কথা, এই হিসাবে প্রচলিত প্রণালী কতকটা tentative—অর্থাৎ করিয়া না দেখিলে বা trial না দিলে কিছুই বলা যায় না। Theorist পক্ষে ইহা একটা গুরুতর দোষ। মরেন্স বাবুর উদ্ভাবিত প্রণালীটি এ বিষয়ে একেবারে complete। যে দুইটা রাশির গুণ বা ভাগ করিতে হইবে, তাহাদের factors এবং recurrence-period দেখিয়াই গুণকল বা ভাগকলের কি recurrence-period হইবে, তাহা প্রকৃষ্টাং হির করা যায়। এই সম্বন্ধে মরেন্সবাবুর Theorem কর্তী বাস্তবিকই অমূল্য।

অসম্ভবতঃ এই প্রণালী হইতে বর্গ ও বর্গমূল (square and square root) সম্বন্ধে কতগুলি স্থলব ফল পাওয়া যায়। '১ এর বর্গ (square) এর বে recurrence-period ১; '০১ এর বর্গের period ১০, '০০১ এর বর্গের period ২০০১—এই interesting ফলগুলি অতি সহজেই প্রতিষ্ঠাত হয়।

কোন একটা নুতন প্রণালী উদ্ভাবিত হইলে, বিশেষতঃ প্রাথমিক পণিতে (Elementary mathematics) দুইটা জিনিষ দেখা দরকার। প্রথমতঃ প্রণালীটির যুক্তিযুক্ততা ও বৈজ্ঞানিক মূল্য কিরূপ; দ্বিতীয়তঃ, যুক্তিযুক্ত হইলেও কাজে লাগান কিরূপ সহজসাধ্য। মরেন্স বাবুর প্রস্তাবিত প্রণালীটি যুক্তি ও বিজ্ঞানের পক্ষ হইতে সম্পূর্ণ নির্দোষ, এমন কি, উৎকৃষ্ট; তার পর কার্যতঃ এই প্রণালী অনুসারে অঙ্ক কবা এবং প্রণালীটি মনে রাখা খুবই সহজ। সাধারণ পাঠ্যপুস্তকের এই প্রণালীটি গৃহীত হওয়া—এই দুই কারণেই সম্ভব ও বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়। আমি এই প্রণালীটির প্রতি আমাদের দেশের পণিতজ্ঞ গণিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ

রিপন কলেজের পণিতাধ্যাপক।

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

[জন্ম—১২৭১ সাল , মৃত্যু—১৩২৬ সাল]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বর্তমান বর্ষের সভাপতি বরেন্দ্র অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহোদয় গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে ইহলোক পবিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। গত বর্ষে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা-পরিচালনাব্যবস্থা তাঁহারই সুযোগ্য হস্তে হস্ত ছিল। তিনি সভাপতিরূপে নির্বাচিত হইলে আমার প্রতি পত্রিকার সেই গুরুভার অর্পিত হইয়াছিল। তখন ভাবি নাই যে, তাঁহারই শোকসংবর্ধক বহন করিয়া আমার কণ্ঠব্যের উদ্বোধন করিতে হইবে! যুহার উৎসাহ, উপদেশ ও সহায়তা পরিষদের সর্ববিভাগকে এক সুন্দর সামঞ্জস্যের স্বর্ণশৃঙ্খলে বাঁধিয়াছিল, তাঁহার অভাবে পরিষৎ যে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন, ইহা সহজেই অনুমেয়। তিনি শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও কখনও পরিষদের কাছ্যে অবহেলা করেন নাই। বাহার নিত্য-নিয়ত পরিষদের কর্মক্ষেত্রে বামেন্দ্রবাণ্যব সাহচর্য্য লাভ কবিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন, তাঁহারই জানেন কি, শেষ কয়েক বৎসর, যখন তাঁহার শরীরেব বল ও সামর্থ্য কমিয়া আসিতেছিল, যখন তাঁহার প্রাণপ্রিয়তম কন্যা বোণশ্যা একান্ত স্নেহপবায়ন পিতার চক্ষুর সমক্ষে ধীরে ধীরে মৃত্যুশয্যায় পবিগত হইতেছিল, যখন পাবিবাবিক আধি-ব্যাধি তাঁহার চিন্তাক্রান্ত ললাটে ছবপনের রেখারাজি অঙ্কিত করিয়া দিতেছিল, তখনও পরিষদের কল্যাণে সেই ভবাজীর্ণ দেহে অদম্য উৎসাহেব অনির্বচনীয় তেজ দেদ্যপামান হইয়া উঠিত। পরিষদের সেবার তাঁহাকে কখনও ক্লান্তি অনুভব কবিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তিনি যেমন করিয়া পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন, যেমন করিয়া ইচ্ছাব মঙ্গলকামনা করিয়াছেন, বেক্রপ একান্ত মনে ইহার উন্নতির প্রতি স্তব বিনিয়তাবে নিরীক্ষণ করিতেন, তেমন করিয়া কোনও প্রতিষ্ঠানকে কেহ সেবা করিয়াছেন কি না, সন্দেহ। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা ব্যতিরেকে পরিষৎ এত অল্প দিনেব মধ্যে এত উন্নতি কবিতে পারিত না। অল্প আবস্ত হইতে ইহাকে বহু বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্রেব মধ্যে টানিয়া আনিয়া দাঁড় করাইবার চেষ্টা বাহার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফি ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী নামই সর্বোত্তম উল্লেখ-যোগ্য। ব্যোমকেশ বাবুর নাম আমরা এখনও ভুলিতে পারি নাই, তাঁহার অভাব এখনও পূরণ হয় নাই; রামেন্দ্র বাবুর নামও সাহিত্য পরিষদের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে; তাঁহার অস্তবৎ বহু দিন অত্পূর্ণই রহিয়া বাইবে। নিম্নোক্ত নিম্নবল্য পরিষদকে বাহার আশ্রয় দান করিয়াছিলেন, ভিক্ষার দ্বারা, স্বেচছার ঐকান্তিকতার দ্বারা বাহার পরিষদের জন্ত রাজপ্রাসাদতুল্য ভবন প্রস্তুত করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের স্মৃতি পরিষদের প্রতি ধূলিকণার সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইয়া থাকিবে।

১৩০১ সালে পরিষৎ জন্মগ্রহণ করেন। ১৩০১ সাল হইতেই রামেন্দ্র বাবুকে আমরা

পরিষদের কার্যেব সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট দেখিতে পাই। শোভাবাজার রাজভবন হইতে পরিষদকে যাহারা স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, রামেন্দ্র বাবু তঁহাদের অগ্রতম। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, পবিষৎ একটি সভা বা সমিতিমাত্র নহে, ইহা ব্যক্তি বা সংঘ-বিশেষের অবসর-বিনোদের সহচর নহে; ইহা মাতৃভাষার পুণ্য-ঈর্দেব; ইহা উদীয়মান জাতীয় প্রতিভার প্রধান সাধন ও সহায় হইবে। ভাষা, সাহিত্য-বিজ্ঞানেতি-হাসের কেন্দ্রস্বরূপ এই সাহিত্য-পরিষৎ হইতে আলোকমালা বিচ্ছুরিত হইয়া সমস্ত দেশকে উদ্ভাসিত করিবে। সাহিত্য-শিল্প-সাধনার গণ্যেত্রীভূত হইয়া এই সাহিত্য-পরিষদের মধ্য দিয়া ভাবের গর্জাপ্রপাত দেশকে জ্ঞানশালী, সমৃদ্ধিশালী ও গোববশালী করিবে। সেই আশা লইয়া তিনি বিপদসঙ্কুল কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত মাকুদেবীর সেই মহামহিমময়া মূর্তি দেখিতে দেখিতেই জন্ম মূর্ত্তিত করিয়াছেন।

রামেন্দ্রচন্দ্রের ত্রিবেদী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে একটি সাধাবর্ণ হিতকর অগুষ্ঠানমাত্র মনে করিতেন না। তিনি ইহাকে জাতীয় শিক্ষার কেন্দ্ররূপে পবিণত করিবার জন্ত সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। দেশেব শক্তি ও অর্থ এক স্থলে সংহত করিয়া, দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম-ভাবাববোধে—নিয়োজিত করিতে হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার জীবনেব প্রধান আকাঙ্ক্ষা। এই উদ্দেশ্যে তিনি দেশেব বিস্তারিত বদান্ত ব্যক্তিগণকে ও প্রতিভাশালা যুবকবৃন্দকে একত্র করিয়া সাহিত্য-পরিষদের কার্যে লাগাইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার একনিষ্ঠ সেবাপরায়ণতা চুখকের হায় সকলকে আকৃষ্ট করিত। সেই জন্ত তিনি কখনও অর্থের অভাব বড় একটা অনুভব করিয়া যান নাই। লালগোলায় রাজাবাহাজুর এবং কাশিমবাজারের মহাবাজ রামেন্দ্র বাবুর অধ্যক্ষতাকালে গৃহনির্মাণকালে ও গ্রন্থপ্রকাশে পবিষদকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। অজ্ঞাত অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি গৃহ-নির্মাণ-তহবিলে ও রামেন্দ্র বাবু কর্তৃক প্রস্তাবিত স্থায়ী ভাণ্ডারে যথেষ্ট অর্থদান করিয়াছিলেন। পবিষৎ ক্রমে গবর্নমেন্টেব দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং লর্ড কারমাইকেলেব গবর্নমেন্ট পবিষৎকে বার্ষিক বাবদত টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছিলেন। অবশ্য এ সকল বিষয়ে কৃতকার্যতা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তকী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রমুখ কর্মাধ্যক্ষগণের সহকারিতাও কম সহায়তা করে নাই। পরিষদের সভ্যসংখ্যাও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াছে। বস্তুতঃ আমি এরূপ ভূনিয়াছি যে, ভারতবর্ষের মধ্যে আর কোনও সভ্যসমিতির এত সমস্ত নাই। সে বাহাই হউক, পরিষদের উন্নতির ইহাই শেষ সীমা নহে; বস্তুতঃ আমরা এখনও আদর্শেব বহু দূরত্বাভে পড়িয়া আছি। তঁহা হইলেও, ইহা স্বীকার না করিলে চলিবে না যে, রামেন্দ্র বাবুর অধ্যক্ষতার কয়েক বৎসর মধ্যে পরিষৎ বেক্রপ দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত আশাপ্রদ এবং অধ্যক্ষতার প্রভুত দক্ষতার পরিচায়ক।

রামেন্দ্র বাবু যে কত ভাবে সাহিত্য-পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন, এই প্রবন্ধের

সম্মান পরিচয় তাহাব পরিচয় প্রদান করা সম্ভবপন নহে। তিনি ১৩০১ বঙ্গাব্দে একবার সম্পাদক-পদে বৃত্ত হন। ১৩০২ ও ১৩০৩ সালে তিনি কার্য্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্যপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৩০৪ ও ১৩০৫ সালে প্রবন্ধ-ব্যয়-পত্রীকাকের কার্য্য করেন এবং ১৩০৬ হইতে ১৩১০ সাল পর্য্যন্ত তিনি পত্রিকা-সম্পাদকের পদে মনোনীত হন। ১৩০৬-সালেই পরিষৎ রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের প্রাসাদ হইতে কর্ণওয়ালিস্ ট্রাটে একটি ক্ষুদ্র ভাড়াটিয়া গৃহে উঠিয়া আসে। ১৩১০ সালে রামেন্দ্র বাবুর চেষ্টায় লালগোলায় রাজাবাহাদুর গ্রন্থপ্রকাশার্থ ৩০০ টাকা হিসাবে পরিষদকে দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ১৩১১ হইতে ১৩১৮ পর্য্যন্ত রামেন্দ্র বাবু পরিষদের সম্পাদক ছিলেন।

১৩১১ সালে নিয়মপ্রাথমিক শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে এক আলোচনায় উপস্থিত হয়। তাহাতে এমন সম্ভাবনাও হইয়াছিল, বুঝি বা বঙ্গভাষাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইংরেজী বাঙ্গালী জাতির মধ্যে পরস্পর বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে জেনারল্ এসেমব্লিজ কলেজে একটি সভার আয়োজন করিয়া রাখা গেল। ঠাকুর 'সফলতার সহপায়' নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ সভার সভাপতিরূপে রামেন্দ্র বাবু বঙ্গভাষা ব্যবচ্ছেদেব তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সেই হইতে প্রাথমিক এবং উচ্চ-শিক্ষার বঙ্গভাষার প্রচলন সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবু পরিষদের দৃষ্টি দিয়া নানা চেষ্টাব অবতারণা করেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বঙ্গভাষাই বাঙ্গালীর জাতীয় শিক্ষার স্বাভাবিক ধারারূপ। মাতৃ-ভাষাকে বর্জন করিয়া, কষ্ট-সাধ্য বিদেশীয় ভাষাকে আশ্রয় করিলে জ্ঞানের সাফল্য-লাভ হইতে পারে না। মাত্র বেকরূপ ধীরোদাত্ত প্রভৃতি বর-সংবলিত না হইলে কার্য্যকর হয় না, জ্ঞানও সেইরূপ মাতৃভাষার পুণ্য অঙ্কে পুষ্ট না হইলে ফলোপধায়ক হয় না। রামেন্দ্র বাবু ইংরেজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন; তিনি ইংরেজি পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নতত্ত্বে যথেষ্ট কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার এই দেশ-প্রথিত জ্ঞান-গরিমার দ্বারা নিজের প্রতিষ্ঠা বাড়াইবার পূর্বে তিনি তাঁহার দেশের লোকের ও দেশের সাহিত্যের সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া ছিলেন। বিজ্ঞানগারে নূতন নূতন গবেষণার দ্বারা বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিব, এ চিন্তা তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। কিসে মাতৃভাষাকে সৌষ্ঠব-মণ্ডিত করিব, বঙ্গ-সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়া দেশীয় শিক্ষার শুদ্ধ প্রায় মূলকে সম্ভাবিত করিব, বিবেক বিজ্ঞান-দর্শনকে মাতৃভাষার সুধাসিক্ত করিয়া দেশের লোকের মধ্যে পরিবেষণ করিয়া দিব, ইহাই তাঁহার সাধনার বিষয় ছিল এবং এই সাধনার মধ্যে কে ত্যাগস্বীকারের মহিমা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার কল্পনা-কিরণে বহু দীর্ঘ পর্য্যন্ত বঙ্গের সাহিত্য-গগনভাষার ইহা রহিবে। আজ যে বঙ্গ-জ্ঞান সাহায্যে বিশ্ববিজ্ঞানের সর্বোচ্চ সীমা-গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে সাহিত্য-পরিষদের কৃতিত্ব কতখানি এবং সেই কৃতিত্বের কতখানি রামেন্দ্র বাবুর, তাহার হিসাব-নিকাশ করা কঠিন। কিন্তু ইহা বঙ্গভাষার ঐতিহাসিককে এক দিন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেই হইবে যে, বঙ্গভাষার উন্নতির জন্য যে আকাঙ্ক্ষা গত কল্পকাল হইতে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মন

আন্দোলিত কবিগুরু, শাহ সাহিত্য-পরিষদের নানা চেষ্টা ও কার্যক্রমের মধ্যে মুখ্য হইয়া উঠিয়াছেন। ১৯১১ সালে প্রথম বামেন্দ্র বাবু এই সম্বন্ধে সাহিত্য-পরিষদের কর্তব্য নিদর্শন জ্ঞাত এক প্রত্যাশাবান এবং তাহাব ফলে এক শাখা-সমিতি গঠিত হয়। এইখান হইতেই এ সম্বন্ধে এক দেশব্যাপী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ১৯১৪ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন প্রাঃ দিঃ হইয়া এই নবীন আকাঙ্ক্ষাকে মূর্তি দান করিয়াছিল। সম্মিলনের কল্পনা ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিবাব ভাব গ্রহণ কবিগুরুছিলেন বামেন্দ্র বাবু। কাশিমবাজারেব সেই প্রথম সম্মিলনে বামেন্দ্র বাবুই সাবস্বত ভবন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন ও সে প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই সম্মিলনের বৈঠকে যাব একটি আবণীয় ঘটনার উল্লেখ, বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বামেন্দ্র বাবুর অনুবোধে লালগোলাব বদান্ত বাজাবাহাদুর পরিষৎ-মন্দিবেব দ্বিতল নিশ্চাণেব নায়ভাব-বহনে তজ্জাকার করেন। ১৯১৫ সালে কাশিমবাজারেব মাননীয় মহা-বাজেব এণ্ড লালগোলাব বাজাবাহাদুরেব বদান্ততায় সাহিত্য-পরিষদের মন্দিব নির্মিত হইলে, পরিষৎ সমাবেশেব সংস্কৃত নবগৃহে প্রবেশ করেন। অনেক বিজ্ঞোৎসাহী ধনী ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান কবিয়াছিলেন। বামেন্দ্র বাবু তাহাদেব নিকট একটি স্থায়ী ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার সংকল্প উপস্থাপিত কবিলে, তাহাবা সেই ভাণ্ডাবে অর্থ-সাহায্য কবিতো প্রতিশ্রুত হইয়া-ছিলেন। এই প্রকারে প্রায় ২৩ সহস্র মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছিল। বামেন্দ্র বাবু আমরণ যথের মত এই পায়ী ভাণ্ডাবটিকে পাহারা দিয়া গিয়াছেন। তাহাব প্রতি হস্তক্ষেপ তিনি কিছুতেই সহিতে পারিতেন না।

তাহাব পর বৎসর অর্থাৎ ১৯১৬ সালে বামেন্দ্র বাবু পরিষৎ মন্দিবে বিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রবর্তন করেন এবং নিজেই তাহাব প্রস্তাবনামুতকপ ‘মায়াপুর্বা’ নামক একটি অতি সাবগত ও সংস্কৃত পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে বামেন্দ্র বাবু অতি সুন্দর ভাবে দেখাইতে চেষ্টা কবিয়াছেন যে, নানা বৈজ্ঞানিক শক্তির অপূর্ণ বিকাশে এই বিশ্বকে এক বিচিত্র মায়াপুর্বাকপে পরিণত কবিয়াছে। বৈজ্ঞানিক তথ্য বামেন্দ্র বাবু যেমন রূপয়গ্রাহী ভাবে বঙ্গভাষায় প্রকাশ কবিতো পারিতেন, তেমন আব কেহই পারেন নাই। এমন সুন্দর ও সবল ভাবে তিনি দর্শন ও বিজ্ঞানের গভীর ও জটিল বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করিতেন যে, তাহা সকলের বিশ্বয় উৎপাদন কবিত।

বামেন্দ্র বাবু যে বৈজ্ঞানিক বক্তৃতামালার উদ্বোধন করেন, তাহাতে ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী, ডাঃ ইন্দুনাথ মল্লিক ও হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। কিছু দিন চলিয়া এই বক্তৃতামালা বন্ধ হইয়া যায়। পরে আবার শাব জগদীশচন্দ্র বসু নেতৃত্বে এইরূপ বক্তৃতার প্রবর্তন হইয়াছে। অধ্যাপক ঘননাথ সর্কর, বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও রায় বাহাদুর চণীলাল বসু প্রভৃতিকে আমরা বক্তাকপে পাইয়াছি।

১৯১১ সাল হইতে লালগোলাব বাজাবাহাদুর গ্রন্থপ্রকাশে সাহায্যার্থ তিন শত টাকা করিয়া দিতেছেন। পরে ১৯১২ সাল হইতে রাজাবাহাদুর এই দান বাড়ানিয়া ৮০০ টাকা করেন।

১৩১৬ সালে পরিষদের চিত্রশালা (Museum) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ত্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণাস বঙ্গোপাধ্যায় ইহার অধ্যক্ষ-পদে মনোনীত হন। কাশিমবাজার ও লালগোলায় ভূপুতিগণ ও অন্ত্র অনেক হিতৈষী ব্যক্তি মুদ্রা ও অন্ত্রাদি সামগ্রী দান করিয়া ইহার কলেবর পুষ্ট করিয়াছিলেন। এই বর্ষেই জাগলপুর সাহিত্য-সংগঠনে রামেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবে রমেশচন্দ্র দত্তের স্বতি-স্বত্বক্ষণার্থ সারস্বত ভবন-প্রতিষ্ঠার সংকল্প পরিগৃহীত হয়। এই সারস্বত ভবনের অত্র পরিষদের চিরস্থায়ী ও বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তারের তত্ত্বাবধায় কাশিমবাজারাধিপতি তুমি দান করেন। পরে ১৩২৪ সালে বঙ্গদেশের গবর্ণর বাহাদুর লর্ড কারমাইকেল এই রমেশ-ভবনের ভিত্তিস্থাপন করেন। ১৩১৭ সালে বিখ্যাত পণ্ডিত রোদেনষ্টাটন চিত্রশালা পরিদর্শন করিয়া ইহার বহু স্তুতিয়তি করেন। রমেশ-ভবন-নিৰ্ম্মাণ রামেন্দ্র বাবুর জীবনের একটি গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং ইহা যে সম্পন্ন করিতে পারেন নাই, এ ক্ষোভ তিনি কখনও ভুলেন নাই। আমাদের সকলেরই মনে রাখা কর্তব্য যে, রমেশচন্দ্র-স্মৃতিসৌধ নির্ম্মিত হইলে তাহা রামেন্দ্র বাবুরই অত্মতম কীর্তিস্তম্ভ হইবে। রামেন্দ্র বাবুর কথায় আমরাও সকলকে আহ্বান করি,—

“রমেশচন্দ্রের ভারতবাসী বহুগণ, যাহারা কর্মক্ষেত্রে তাঁহার সহায় ছিলেন, সমাজে তাঁহার সখা ছিলেন, গৃহে তাঁহার সুখ-দুঃখের ভাগী ছিলেন, তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় বঙ্গের সারস্বত ভবন, বঙ্গের সারস্বত ভাণ্ডার, বঙ্গের জাতীয় চিত্রশালা, যেখানে প্রাচীন বঙ্গ আপনাকে উদ্ঘাটিত করিবে, যেখানে বর্তমান বঙ্গ নিরীক্ষিত ও আলোচিত হইবে, যেখানে ভবিষ্যৎ বঙ্গ আশার ও আকাঙ্ক্ষার চিত্রে চিত্রিত হইবে, বঙ্গের ভারতী যেখানে পূজা পাইবেন, বঙ্গের লক্ষ্য যেখানে আপন ঐশ্বর্য্য প্রকটিত করিবেন, সেই সারস্বতী-ভবন—সেই রমেশভবন—সেই রমেশ-ভবন-প্রতিষ্ঠার অত্র আপনাদিগকে প্রাৰ্থনা করিতেছি।”

এই বর্ষে আর একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটে, যাহার প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নাম না করিয়া পারা যায় না। পরিষদের গ্রন্থাগার ১৩০১ সালে রামেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবেই স্থাপিত হয়। ধীরে ধীরে ইহাতে অনেক মুদ্রিত ও হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি সংগৃহীত হয়। কিন্তু সম্ভ্রান্তি যে বিদ্যুৎ-পুস্তকালয় পরিষদের শোভা সম্পাদন করিতেছে, তাহা পরিষদগ্রন্থাগারের বহুকালসঞ্চিত গ্রন্থরাশির দ্বারাও সম্ভব হইত না। পুণ্যলোক দেবরচন্দ্র বিভাসাগরের সুসজ্জিত পুস্তকরাশিই পরিষদগ্রন্থাগারের কলেবর ও মূল্য অশেষভাবে বর্দ্ধিত করিয়াছে। বিভাসাগরস্বামীজী ১৩১৬ সালে পরিষদে স্থানান্তরিত হয় এবং ১৩১৭ সালে রামেন্দ্র বাবুর স্বহস্তে ও পরিষদের তত্ত্বাবধায় লালগোলায় রাজাবাহাদুরের অর্থসহায়ত্বে ইহা পরিষদে বস্তুনিষ্ঠ কর্তৃত্বপাইয়াছে এবং সম্ভবতঃ অচিরকালে ইহা পরিষদ-পুস্তকালয়ত্ব হইবে।

১৩১৭ সালে, বঙ্গদেশের ভিত্তিস্থাপন আবিস্কৃত হয় এবং কাশিমবাজারাধিপের অর্থ প্রদানের দ্বারা পরিষদের অত্র খরচ করা হয়। এই বর্ষেই রামেন্দ্র বাবুর বহু ইচ্ছাগুলি, যাহা চিত্রশালায়, পুস্তকালয়ে, পুণ্যলোকে সম্পাদন করিতে অসমর্থ হইতেন। চন্দ্রদাসের এতগুলি

পদ ইহার পূর্বে আর কোনও গ্রন্থেই সংকলিত হয় নাই। পর বৎসর আব একশাসি মূল্যবান গ্রন্থ—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সংগৃহীত হয় এবং প্রাচীন সাহিত্যে অগণিত ত্রীযুক্ত বঙ্গস্বকীর্তন ইহার বিবরণে ইহার সম্পাদনভাব গ্রহণ করেন। বামেন্দ্র বাবু এই গ্রন্থের একটি স্থল কৃত্তিকা লিখিয়া দিয়াছেন। ইহার পূর্বে বোধ হয়, কোনও প্রাচীন গ্রন্থেই এরূপ সর্কাবহুস্বকীর্তন ভাবে সম্পাদিত হয় নাই : ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ সম্ভবতঃ সর্কাপেক্ষা প্রাচীনতম, বদ্যাকরে লিখিত, বাক্যলা পুথি।

১৮৮৮ সালে সাহিত্য-পরিষদের নিয়মাবলী-পরিবর্তন একটি বিশেষ ঘটনা। পরিষদের কার্যক্ষেত্রে পবিসব-বুদ্ধি হওয়ায় সংস্কারের প্রয়োজন হইয়াছিল এবং পরিষদের সৌভাগ্যক্রমে রামেন্দ্র বাবু সে সময়ে কর্ণধার ছিলেন। নিয়মাবলী পরিবর্তনে ত্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্তের সাহায্য বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

ঐ বৎসর সাহিত্য-পরিষৎ ত্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পঞ্চাশৎ জন্মতিথি উপলক্ষে সংবর্দ্ধনা করেন। রবীন্দ্র বাবু তখনও বিশ্বের সভায় ববণীয় হইতে পারেন নাই। বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবি বঙ্গজননী বালীকানন্দরূপ বাঙ্গালীর হস্তের মাদলিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অভিনন্দন রচনা ও পাঠ করিবাব তার পড়িয়াছিল রামেন্দ্র বাবুর উপর। অভিনন্দনের ভাষা সাহিত্যিক কারুকার্যে অপরূপ মিলন। ১৮৮৯ সালে সাহিত্য-পরিষৎ বামেন্দ্র বাবুকে সংবর্দ্ধনা করেন। এই আনন্দোৎসবে অভিনন্দন পাঠ করিয়াছিলেন রবীন্দ্র বাবু। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতিরূপিত এই যুগলবে শ্রদ্ধাবিনিময় বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসেব একটি পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া বাথিবে। রামেন্দ্র বাবুর মৃত্যুর পূর্বেও বাঙ্গালীর এই দুইটি ববেণ্যতম সন্তানকে আমরা একবার বিচিত্র অবস্থানের মধ্যে একত্র দেখিতে পাইয়াছি। ২৩শে জ্যৈষ্ঠ বামেন্দ্র বাবু নামবলীলা সংবরণ করেন; ১৯শে জ্যৈষ্ঠ রবীন্দ্র বাবু প্রাতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ইহার কিছু পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের নাইট উপাধি-পরিচ্যাগ সংবাদপত্রের স্তম্ভে তারত্ববে ঘোষিত হইয়াছিল। রামেন্দ্র বাবু সৌভাগ্যক্রমে এ সংবাদ পাঠ করিয়া রবীন্দ্র বাবুর দর্শন কামনা করেন। সোমবার প্রাতে রবীন্দ্র বাবু রামেন্দ্র-জন্মরের রঙ্গ শয্যাপাশ্বে উপস্থিত হন। তিনি জানিতেন না যে, রামেন্দ্র বাবুর অবস্থা সৎকটাপন্ন; জামিবার কোনও উপায় ছিল না। কেন না, রবীন্দ্র বাবু আগমনেও তাঁহার ভ্যাসের সাহিত্যে রামেন্দ্র বাবু উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার চক্ষুর স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা উজ্জ্বলিত হইয়াছিল। তাঁহার সনির্বন্ধ অহুসোণে রবীন্দ্র বাবু উপাধি-পরিচ্যাগ-পত্রখানি পাঠ করিয়া শুনাইলেন। আমি শুনিয়াছি যে, তাহার কিছু পূর্বেই রামেন্দ্র বাবুর সৌভাগ্যক্রমে হয়; আর তিনি কথা কহেন নাই। মৃত্যুশয্যায় পড়িয়াও রামেন্দ্র বাবু দেখিতেই প্রেরণা কি প্রাণান্তিক আশ্রয়ের সহিত অহুতব করিতেন, উপরিদিখিত ঘটনা তাঁহারই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বাঙ্গালার বিশ্ব-বিশিত কবি রামেন্দ্রজন্মরকে বৈরাগ্য প্রদান করিতে দেখি; তাঁহাই প্রত্যেক বঙ্গবাসীর অন্তরের কথা,—“সর্বজনপ্রিয় কবি, সীমাবদ্ধতা-প্রতিরোধী”

গুণের চিত্তলোক অভিযুক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাত সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিনন্দন করিতেছি।”

১৩১২ সালে রামেন্দ্র বাবু শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। মাথার পীড়ার জন্ত তিনি পরিষদের কার্য্য হইতে কিছু কালের জন্ত অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু এ সময়েও তিনি পরিষদের কার্য্যে পরামর্শ ও উপদেশ দিতে বিরত হয়েন নাই। যেখানে ক্রটি, যেখানে অসম্পূর্ণতা, যেখানে মনোমালিন্য ঘটিত, সেখানেই রামেন্দ্র বাবু হস্ত-সংকেত কর্তব্যপথ, উন্নতির পথ, শাস্তির পথ নির্দেশ করিয়া দিত। পরিষদের কর্তৃপক্ষগণ সকল বিষয়ে রামেন্দ্র বাবুর দিকে চাহিতেই অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, তাই আজ তাঁহার অভাবে তাঁহারা, সহসা কর্ণধার বিরোধে স্বদক্ষ নাবিকেরাও যেরূপ চঞ্চল হইয়া পড়ে, সেইরূপই চঞ্চল হইয়াছেন।

রামেন্দ্র বাবু অসুস্থ শরীরেই কলিকাতা সাহিত্য-সম্মিলনে বৈজ্ঞানিক শাখার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। কর্তব্যের আহ্বান তিনি কখনও অগ্রহেলা করেন নাই এবং তিনি যে সেবাত্মক জীবনের সাক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রাণপাত কবিয়া সম্পন্ন করিতে কখনও ক্রটি করেন নাই। আমার মনে হয়, তিনি এমন করিয়াই তাঁহার ভ্রমগ্রবণ স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার শরীর একটু সুস্থ হইতে না হইতেই তিনি নিজ ইচ্ছাক্রমে ১৩২২ সালে পরিষদের সহকারী সম্পাদক পদ গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিতে আবৃত্ত করেন। পবিষৎ যদিও তাঁহার বোগ্য, সহকারী সভাপতির পদ, তাঁহাকে প্রদান করিলেন, তথাপি সে নিষ্ক্রিয় পদে তিনি বেশী দিন আপনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলেন না। তিনি ১৩২৪ সালে রেজিষ্ট্রার হস্তে গত ছই বৎসর কাল কাটাইয়াছে। পত্রিকা-সম্পাদন-কার্য্যে তাঁহার উৎসাহের অবশিষ্ট ছিল না; সর্ববিভাগে কৃতিত্ব থাকা হেতু তিনি পরিষৎ-পত্রিকাখানিকে অনেক বিষয়ে উন্নীত করিয়া গিয়াছেন।

রামেন্দ্র বাবুর শরীর ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। এই কারণে গত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বার্ষিক সম্মিলনে পরিষৎ, তাঁহাদের দেয় সর্বোচ্চ সম্মান—সভাপতিপদ— তাঁহাকে প্রদান করিলেন। অনেক মনে করিতে পারেন যে, এই সভাপতি-পদ বহু দিন পূর্বে রামেন্দ্র বাবুর পাওয়া উচিত ছিল। তাঁহারা জানেন না যে, গত কয়েক বৎসর ধরিয়া পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগের পরামর্শ সাধারণতঃ রামেন্দ্র বাবুর ভবনেই হইত এবং রামেন্দ্র বাবুর নির্দেশ-মতই অনেকটা কার্য্য হইত। এ ক্ষেত্রে রামেন্দ্র বাবুকে সভাপতিপদ-গ্রহণে সম্মত করা হুঃসাধ্য ছিল। এ বৎসর কার্য্যনির্বাহক-সমিতি তাঁহাকে সভাপতি-পদে মনোনীত করিলেন শুনিয়া তিনি যে প্রভু বিধিমাছিলেন, তাহার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি,—“আমি চিরজীবন পরিষদের সেক্রেটারী-কার্য্য করিয়া রাইব, ইহাই আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা—পরিষদের নেতৃত্বগ্রহণ আমার কাজ নহে। কার্য্যনির্বাহক-সমিতি আমার এই চিরপোষিত আকাঙ্ক্ষার বাধা দিবেন কি?”

আমি এত কণ সাহিত্য-পরিষদের দিক্ দিয়াই রামেন্দ্র বাবুর কার্য্যকলাপের আলোচনা

করিয়াছি। বস্তুতঃ আমার মনে হয় যে, সাহিত্য-পরিষদের প্রথম শতাব্দিকপাদের ইতিহাস অনেকাংশে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর জীবন-চরিত। কিন্তু সাহিত্যেও তাঁহার কৃতিত্ব কম ছিল না। রামেন্দ্রবাবুর 'প্রকৃতি' ও 'জিজ্ঞাসা' বঙ্গসাহিত্যেব অপরিহার্য অঙ্গমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ভাষার সৌষ্ঠবে ও প্রসাদগুণে এবং ভাবের গভীরতায় এই দুইখানি গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। 'জিজ্ঞাসা' জার্মান ভাষায় অনূদিত হইতেছে। রামেন্দ্র বাবুর ভাবকলা চিন্তার প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া দেয়; তাঁহার সংশয়-বিতর্কপ্রসঙ্গের মধ্যে পাঠক নিজের মনেব প্রতিবিম্ব দেখিতে পান। আমি ভবসা করি যে, রামেন্দ্র বাবুর চিন্তা-প্রণালীর সহিত পাশ্চাত্যজগতের পরিচয় হইলে, তাহা যথেষ্ট আদৃত হইবে। রামেন্দ্র বাবুর 'চরিতকথা'র কতকগুলি সুন্দর জীবনী অতি সুন্দর ভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহার কয়েকটি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার 'কর্মকথা'র অনেক দার্শনিক ও চারিত্রনৈতিক তত্ত্ব প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের সহিত, অথচ সাধারণেব সহজবোধ্য ভাবে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'ধর্মের জয়', 'যজ্ঞ' ও 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' নামক প্রবন্ধে তিনি যে মনস্তত্ত্বাব পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অজ্ঞ কোনও লেখকের মধ্যে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার প্রবন্ধগুলির একটি বিশেষত্ব এই যে, গভীর বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বগুলি তাহাদের স্বাভাবিক জটিলতা পূর্ববাপূর্বক প্রাথমিক কবিত্বের মাধুর্য্যসম্পদ লাভ করিয়াছে। তিনি ষাটি বৈজ্ঞানিকের মত পারিভাষিক শব্দ-কণ্টকিত নীতিসংক্রান্ত দ্বারা সত্যের শব্দব্যবচ্ছেদ করেন নাই সত্য, কিন্তু তাহাব কাবণ বোধ হয় এই যে, তিনি পাশ্চাত্য বীতি অনুসারে সত্যকে কোনও দিন আংশিক ভাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই। আধুনিক যে শ্রমবিভাগ-ফলে জড়বিজ্ঞান জড়ের ধর্ম লইয়াই ব্যাপৃত থাকে, আত্মীয় ব্যাপারের প্রতি ফিরিয়াও চাহে না; যে রসায়নবিজ্ঞান পদার্থের সংযোগ বিয়োগ লইয়াই ব্যস্ত থাকে, পদার্থের উৎপত্তি ও লয়ের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করে না; সে শ্রমবিভাগ তাঁহাকে তৃপ্ত করিতে পারে নাই। একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক যেমন নক্ষত্রখচিত নভোমণ্ডল এবং আধ্যাত্মিক জগতের নিয়ম-পরম্পরাকে প্রকৃতির যুগ্ম-রহস্য ঘন করিয়া যুগপৎ তাহাদের উল্লেখ করিয়াছিলেন, রামেন্দ্র বাবু তাঁহার জীবনে সত্যের সেইরূপ অখণ্ডনীয় স্বরূপ অনুভব করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভা ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্বেব মধ্যে এমন অপূর্ব রসসঞ্চারে সমর্থ হইয়াছিল, যাহার দৃষ্টান্ত বঙ্গসাহিত্যে বিরল। এই বৈশিষ্ট্যই তারতবর্ষের একান্ত নিজস্ব প্রতিভা। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র অথবা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, কেহই ভারতীয় প্রতিভার সঙ্গে নিজস্ব প্রভাব হইতে আপনাকে বিযুক্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের বিজ্ঞানালোচনার মধ্যেও উপনিষদের সেই চিরপুরাতন সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। বিজ্ঞানীগণের ধূলিধূস্র, অ্যাসিড ও অ্যালক্যালির মধ্যেও ভারতের সনাতন জ্ঞানগরিমা অভিব্যক্তি লাভ করিতে ছাড়ে নাই।

সাহিত্য-বিভাগে রামেন্দ্র বাবুর প্রতিভা নানা দিক দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তিনি

নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করিয়া মাতৃভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাহাব অনেকগুলি এখনও মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠে আবদ্ধ রহিয়াছে। সেগুলিকে মুক্তি দান করিয়া কবে আমরা দিনের আলোকে লইয়া আসিতে পারিব, তাহা বিধাতাই জানেন! তবে বঙ্গসাহিত্যের হিতকারী কোনও ব্যক্তি এই বিষয়ে মনোবাগী হইলে ভাল হয়। আমরা সাহিত্য-সংসারে বেকরপ শ্রম মূলধন লইয়া বাবলায় করি, তাহাতে রামেন্দ্র বাবুব প্রবন্ধের জায় অমূল্য সম্পদ অবহেলা করিয়া কেলিয়া রাখিলে আমরাদিগকে প্রত্যাশায়ভাগী হইতে হইবে। শ্রীযুক্ত বিপিন-বিহারী গুপ্ত রামেন্দ্র বাবুব বিচিত্র জ্ঞানভাণ্ডার হইতে কি অপূর্ণ রত্ন-সকল আহরণ করিয়াছেন, তাহা 'বিচিত্র প্রসঙ্গে'র পাঠকগণেব অবদিত নাই। কিছু দিন পূর্বে রামেন্দ্র বাবু তাঁহার কলেজের অধ্যাপকবৃন্দের সভায় যে দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন এবং যাহা 'ভারতবর্ষে'র কতিপয় সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল, সেগুলিও ভাবসম্পদে অতুলনীয়।

সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থ-বিভাগে রামেন্দ্র বাবুর ঐতবেয় ব্রাহ্মণেব অনুবাদ একখানি মূল্যবান গ্রন্থ। এই দুইগ্রন্থ গ্রন্থের যথাযথ অনুবাদ করিতে ত্রিবেদী মহাশয়কে বহু আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ইহার অনুবাদ করিতে গিয়া তাঁহাকে লুপ্ত বৈদিক ক্রিয়াকলাপেব বর্ধাৎ প্রকৃতি নির্ণয় করিতে হইয়াছিল। মার্টিন হাউগ কর্তৃক যে অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই পৃথিবীর সাহিত্যে ঐতবেয় ব্রাহ্মণেব প্রথম অনুবাদ। কিন্তু এই অনুবাদ বৈদিক যজ্ঞকাণ্ডের সম্বন্ধে জগতে অনেক ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করিয়াছিল, রামেন্দ্র বাবু বঙ্গভাষায় ঐতবেয় ব্রাহ্মণের সঠিক অনুবাদ করিয়া একটি ভ্রান্তের বিষয়ের প্রতি আলোক-পাত করিয়াছেন। বৈদিক যজ্ঞকাণ্ড সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিতেছিলেন, তাহাও এই অনুবাদের অন্ততর ফল। ঐতবেয় ব্রাহ্মণ অনুদিত হইয়া 'ভারতীয় শাস্ত্রপটিক' গ্রন্থমালায় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। রামেন্দ্র বাবুর ইচ্ছা ছিল যে, এই গ্রন্থমালায় অনেক প্রাচীন গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করিবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের দ্বারা 'শতপথব্রাহ্মণেব' বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। দীর্ঘপাতিয়ার কুমারী শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় রামেন্দ্র বাবু কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া এই পুস্তকের ব্যয়ভার বহন করেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় তাঁহার যে প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার একটি জালিকা নিয়ে দেওয়া হইল,—

জীবনী-আলোচনা।

৮৭জনীকান্ত গুপ্ত, ৮হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮ব্যোমকেশ মুস্তাফী।

প্রাচীন সাহিত্য

কালীদাস দাসের বংশপরিচয় ও কাল-নির্ণয়; কালীদাস দাস (ইহার স্থিতি-রক্ষার্থ পরিষৎ যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহার মূলও রামেন্দ্র বাবু ছিলেন।)

'চন্দ্রকলিকা' পুঁথি সম্বন্ধে মন্তব্য।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা! সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবু নিকট পরিষদের ঋণ অপরিশোধনীয়। তিনি প্রথম হইতেই পবিষদে যাহাতে এই বিষয়ের আলোচনা হয়, তাহার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন এবং প্রায় সমস্ত পরিভাষা-সমিতির সম্পাদক ছিলেন। নিম্নলিখিত পরিভাষাগুলি সংকলন ও সংগ্রহ কবিয়া তিনি বঙ্গভাষায় সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন,—

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, বাসার্নিক পরিভাষা, ভৌগোলিক পরিভাষা, গাণিত্যবিজ্ঞান-পরিভাষা, ব্রেটন সাহেবকৃত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা।

ইতিহাস ও প্রকৃত্ত্ব

একখানি প্রাচীন দলিল, বাঙ্গালাটি সম্বন্ধে মতামত; আর একখানি প্রাচীন দলিল, গ্রামদেবতা।

পুস্তক ও পুথি

পরিষদের পুথিখানা রামেন্দ্র বাবুই স্থাপন করেন। তিনি এবং ৮ব্যোমকেশ মুস্তকী পুরাতন পুস্তকেব নোকানে নোকানে ঘুরিয়া পুরাতন পুস্তক সংগ্রহ করেন। রামেন্দ্র বাবু এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রকাশ করেন,—

মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা (লংসাহেবের সংকলিত), বাঙ্গালা পুথির বিবরণ, বাঙ্গালা পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, প্রাচীন পুথির বিবরণ ১ম ও ২য়, বাঙ্গালার আদি রসায়ন গ্রন্থ, গৌরীমঞ্জল, চম্পককলিকা।

ভাষাতত্ত্ব

বাঙ্গালা ব্যাকরণ, বাঙ্গালা কৃত ও তদ্ধিত সম্বন্ধে মন্তব্য; বাঙ্গালা কারক প্রকরণ; না; ধ্বনি-বিচার।

কার্য্যের দাব্য! কর্ত্তার সম্যক পবিচয় দান করা সম্ভবপর নহে। সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পর্কে রামেন্দ্রবাবুর যে কার্য্যাবলী বিবৃত হইল, তাহা অসাধারণ-রূপে বৃহৎ হইলেও তিনি একমাত্র অপেক্ষাও মহত্তর ছিলেন। তাঁহার সুন্দর চরিত্র ও শুভ-ইচ্ছা তাঁহাকে এ সকলের অনেক উর্দ্ধে স্থাপন কবিয়াছিল। তাঁহাব কীর্ত্তি অপেক্ষাও চরিত্র বড় ছিল; এবং সরলতা সে চরিত্রে অতি মনোহর করিয়া তুলিয়াছিল।

তাঁহার কৃতকার্য্যতার মূলে যে গুঢ় মন্ত্র নিহিত ছিল, তাহা এই যে, তিনি আপনাকে কখনও প্রচার করিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন না। এই জন্যই সকলে স্বচ্ছন্দে তাঁহার সম্বন্ধে পরিচয় করিতে অগ্রসর হইত। তিনি ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া কাজ করিয়া বাইতেন; এইজন্যই তিনি সফলতা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।